বিশুদ্ধবাণী

তৃতীয় ভাগ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্
সম্পাদিত

'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া, ৺কাশীধাম
সন ১৩৬২ সাল

[মূল্য দুই টাকা]

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
(২৪ পরগণা)

—প্রাপ্তিস্থান—

১। **মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,**
বিশুদ্ধানন্দ কানন, মালদহিয়া, বেনারস।
অথবা
২ এ, সিগরা, বেনারস।

২। **শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী,**
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

৩। **শ্রীফণিভূষণ চৌধুরী,**
৭৭ (বি), কালী টেম্পল রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

৪। **মহেশ লাইব্রেরী,**
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২।

মুদ্রক—শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কমলা প্রেস,
বেনারস।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেব

বিশুদ্ধবাণী

তৃতীয় ভাগ

অম্বা-স্তোত্রম্

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

হে দেবি দুর্গতিহরে করুণাং কুরুষ্ব
দুঃস্থে নিতান্তমলিনে ময়ি হীনসত্ত্বে।
লব্ধ্বাঽপি সদ্‌গুরুমহো মহনীয়শক্তিং
শোচামি কর্ম্মবিধুরঃ পরিমূঢ়বুদ্ধিঃ ॥ ১॥

হে দেবি, তুমি দুর্গতিহারিণী। আমি দুঃস্থ (দুর্দ্দশাপন্ন), নিতান্ত মলিন ও হীনসত্ত্ব; আমার প্রতি তুমি কৃপা কর। হায়! আমি মহনীয়শক্তি-সম্পন্ন সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও, আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত এবং আমি (গুরুদত্ত) কর্ম্মে কাতর বলিয়া শোচনা (পরিতাপ) করি।

ক্লিশ্যেঽনিশং বিষয় ভাবনয়া বিবিদ্ধো
দৃষ্ট্বাঽপি দোষমমিতং বিরতি র্ন সাধ্যা।
নায়াতি নির্ভর ইমং কুজনং কদাপি
তস্মাৎ ত্বমেক শরণং বরণীয়মম্ব ॥ ২॥

আমি বিষয় ভাবনা দ্বারা বিশেষরূপে বিদ্ধ বলিয়া ক্লেশ পাইতেছি। (উহার) অপরিমিত দোষ দর্শন করিয়াও উহা

হইতে বিরতি (আমার দ্বারা) সাধ্য নহে। আমার মত কুজনে (গুরুতে) নির্ভরও আসে না। এইজন্য হে মা, তুমিই শ্রেষ্ঠ শরণ (আশ্রয়) বলিয়া আমা কর্ত্তৃক বরণীয়া।

জ্ঞানং প্রসীদতি ন মে পরিকর্ম্মহীনে
চিত্তে, ন চাপি বিমলা সমুদেতি ভক্তিঃ।
দৈবং মমাত্র পরিমূর্চ্ছতি নূনমদ্ধ
শান্ত্যৈ তদস্য চরণৌ তব সংশ্রয়ামি ॥ ৩॥

আমার অশোধিত চিত্তে জ্ঞান প্রসন্ন হয় না (ফুটিতে পারে না), বিমলা ভক্তিরও উদয় হয় না। নিশ্চয় এ বিষয়ে আমার দৈবই অতি প্রবল হইয়া রহিয়াছে। সেই দৈবের শান্তির জন্যই হে মা, তোমার চরণযুগল সম্যক্ আশ্রয় করিতেছি।

ত্বৎ-পাদপদ্ম-সুষমা-পরিমুগ্ধ-চিত্তা
দেবা ভজন্তি পরিযন্তি চ সর্ব্বকামান্।
যে চাপি কামরহিতাঃ সততং স্মরন্তি
তৈর্লভ্যতে হি ন চিরাৎ প্রগতির্গরিষ্ঠা ॥ ৪॥

তোমার পাদপদ্মের পরম শোভা দর্শনে মুগ্ধচিত্ত দেবগণ তাহার ভজন করেন এবং তাঁহাদের সকল (বা সর্ব্বার্থ) কামনাও সিদ্ধ হয়। আর যে নিষ্কাম ব্যক্তিগণ সতত (তোমার চরণ) স্মরণ (ধ্যান) করেন, তাঁহারাও অচিরেই গরিষ্ঠা প্রগতি (মোক্ষ) লাভ করেন।

যৎ কিঞ্চ কর্ম্ম মলিনং ক্রিয়তে ক্ষমস্ব
চেতঃ প্রবোধয় বিনাশয় দুষ্টবুদ্ধিম্।

ভক্তিং প্রদেহি চ গুরৌ ত্বয়ি চাম্ব শুদ্ধাং
শান্তিং সমাদিশ শুভং ভবতাৎ সমন্তাৎ ॥ ৫ ॥

আমি (অভ্যাস দোষে) যে কিছু মলিন কর্ম্ম করি, তুমি তাহা ক্ষমা কর। আমার চিত্ত জাগাইয়া দেও, দুষ্টবুদ্ধি বিনাশ কর। গুরুতে এবং হে মা, তোমাতে শুদ্ধা ভক্তি প্রদান কর। শান্তি দেও, এইরূপে সকল দিকে শুভ হউক।

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ

শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত

(১

জীবনের ত্রিশ বৎসর কাল বিষাদ ও ব্যর্থতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্ত মন কেবলই ছুটিয়া চলিত এমন এক রসের সন্ধানে—যেখানে উহা চাহিত স্থির শান্ত ও আত্মস্থ হইয়া মগ্ন থাকিতে। আত্মঘাতের চিন্তাও ঐ মনকে অনেক সময় পাইয়া বসিত—ঐ দারুণ জ্বালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য! মস্তিষ্কের বিকৃতি অবস্থাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। এমন এক অবস্থার মধ্যে একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে এই দিব্য-পুরুষের দর্শন পাইবার সৌভাগ্য হইল! তখন রাত্রি প্রায় আটটা; সাধারণতঃ ঐ সময়ে বাহিরের কোনও লোকের দর্শন পাইবার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু আমি কেন তাঁহার দর্শন পাইলাম, জানি না। প্রণাম করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম—দুই এক মিনিটের বেশী সময় সেখানে থাকি নাই। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কেমন একটা শিহরণ অনুভব করিলাম। তিনি আমার সমস্ত মনটিকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া লইলেন—সারাদেহে ও মনের মধ্যে একটা শূন্যতার ভাব আসিল। সারারাত্রি কেমন একটা আচ্ছন্নভাবের মধ্যে কাটিয়া গেল।

ইহার পর মাঝে মাঝে দর্শন পাইবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে

লাগিলাম, তবে দশ মিনিটের অধিক তাঁহার নিকট থাকিবার আদেশ ছিল না। উত্তর কালে যখনই এই মহাপুরুষের নিকট গিয়াছি, তখনই তাঁহার দিকে একটা বিরাট্ আকর্ষণের ভাব অনুভব করিতাম, উহাতেই সব সময় মূক ও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতাম—মুখ হইতে একটিও কথার স্ফুরণ হইত না। মনের মধ্যে অনেক সংশয় ও সমস্যার ভাব লইয়া তাঁহার নিকট যাইতাম বটে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে কোনও মৌখিক প্রশ্ন করি নাই, অথচ আমার প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম, পাইয়া মনের মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহল জাগ্রত হইত। বাহিরের কোনও লোক আমার কোনও প্রশ্ন জানিতে পারিতেন না—অথচ তাঁহাদের সম্মুখেই আমি নিজের সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতাম। এই কথার মধ্যে একটুও হেঁয়ালার ভাব নাই—ইহা নিছক বাস্তব ও সত্য কথা। এই একই ভাব তাঁহার নিকট হইতে চিরদিনই অনুভব করিয়া আসিয়াছি।

আমার এক সহপাঠী অধ্যাপক বন্ধুর দীক্ষার দিন অপরাহ্ন কালে হঠাৎ আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। উহা ছিল কাশীর দিলীপগঞ্জের আশ্রম। বন্ধুটি আমাকে একটি অর্দ্ধ-দগ্ধ দীপ-শলাকা দেখাইলেন। লক্ষ্য করিলাম যে উহার অপর প্রান্তটি দেখিতে ঠিক একটি কঠিন প্রস্তরের (Flint stone) মত। এই অদ্ভুত দ্রব্যটি দেখিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি আমাকে বলিলেন যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই "বাবার" নিমেষ মাত্রের দৃষ্টিতেই কাঠিটির ঐরূপ আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই বলিয়া তিনি

সিমেণ্টের মেঝের উপর একটি আঁচড় কাটিয়া দেখাইলেন—মেঝের উপর বেশ একটি গভীর রেখা দেখিতে পাইলাম। এই অর্দ্ধ-দগ্ধ দীপ-শলাকাটির আঁচড় আমার এই কঠিন হৃদয়ে ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি নিবিড় রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেল যাহা আজিও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

কাশীতে ক্রমশঃ গরম পড়িয়া আসিতেছিল বলিয়া 'বাবা' কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে আমিও কর্ম্মোপলক্ষে সেখানে যাই, এবং নানাসূত্রে তাঁহার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া ভবানীপুরে গিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ করি। খুব বড় হল ঘর—দুইদিকে সারি করিয়া বহু লোক বসিয়া আছেন; মাঝে মাঝে দুই একটি কথাও হইতেছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনি যখন আহ্নিক করিবার জন্য উঠিলেন—সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। শুনিলাম তাঁহার পদস্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এইজন্য সকলে দূর হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছিল। তিনি আমার নিকটে অগ্রসর হইলে আমি নিষেধ অমান্য করিয়াই তাঁহার চরণ-যুগল নিজ মস্তকে ঘর্ষণ করিয়া লইলাম। মনে মনে প্রার্থনা জানাইলাম যেন অচিরেই ঐ পরম পদে আশ্রয় লাভ করিতে পারি। মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই আমার সর্ব্ব শরীর যেন অগ্নির তেজে দগ্ধ হইয়া গেল, এবং চক্ষুর সম্মুখে এক বিশাল তেজোময় আলোকরাশি উদ্ভাসিত হইয়া আমার দৃষ্টিশক্তিকে যেন লুপ্ত করিয়া দিল। মস্তিষ্কের মধ্যেও এত বেশী উষ্ণতা অনুভব

করিলাম যে ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হইতে লাগিল। পথের শুভ্র গ্যাসের আলোক-রশ্মি সমূহ লাল বর্ণ মনে হইতে লাগিল। বাড়ী ফিরিয়া অনুভব করিলাম যেন আমি অন্ধ হইয়া যাইব—মস্তকের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। পাঁচ সাত দিন প্রায় একই ভাবে কাটিয়া গেল। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সময় সময় কাঁদিয়া ফেলিতাম, এবং বলিতাম—"তুমি আমাকে অমন ভাবে পাগল করিয়া দিলে কেন?" আট দশ দিন পরে পুনরায় ভবানীপুরে গিয়া তাঁহার দর্শন করি। দেখা মাত্রই তিনি অতি স্নেহ-পূর্ণ কোমল স্বরে আমাকে বলিলেন—"কি গো, একটু সামান্য তেজেই অভিভূত হইয়া পড়িলে?" যাহা হউক, আমি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিলাম। এই অকিঞ্চনের জীবনে তাঁহার দিব্য লীলার উহাই প্রথম পরশ।

ইহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য যাইতাম। তখন কত লীলাই না তিনি দেখাইতেন! এই সব যিনি দেখিয়াছেন তিনিই 'বাবার' প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছেন। তবে দেখিলেই ত' ধরা যায় না,—পাওয়া ত' বহু দূরের কথা। তাঁহার এই অনন্ত লীলার কথা কে বর্ণনা করিবে? একদিন এক ভদ্রলোক, বেলা প্রায় চারিটার সময়, বাবার নিকট (ভবানীপুরে) কলার পাতায় মোড়া এক প্যাকেট বেল ফুল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বাবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহার মধ্যে কি আছে?" ভক্তটি বলিলেন—"বেল ফুল"। এই ফুলের উগ্র গন্ধ নিকটস্থ আমরা সকলেই উপভোগ

করিতেছিলাম। 'বাবা' হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"খুলিয়া দেখ—উহা চাঁপা ফুল কিনা।" ভদ্রলোকটি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন যে, তিনি যে দোকান হইতে উহা কিনিয়াছেন চাঁপা ফুল তাহার নিকট আদৌ ছিল না, যদিও ঐ ফুলই কিনিবার তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বাবার আজ্ঞামত ঐ প্যাকেটটি খুলিবার পর আমরা দেখিলাম যে বাস্তবিকই সমস্ত ফুলগুলি কনক চাঁপা এবং তাহার গন্ধও অতি তীব্র। বাবার নির্দ্দেশ মত আমরা সকলে এক একটি ফুল লইলাম।

এইরূপ ভাবে লীলা দেখাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে একবার তিনি বলিয়াছিলেন –"তোমাদের মনে ভগবৎ-শক্তি বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার জন্যই মধ্যে মধ্যে আমাকে এইরূপ শক্তির খেলা দেখাইতে হয় এবং সেজন্য আমাকে দণ্ডও গ্রহণ করিতে হয়।" কুমারী-মাতার সেবা করাই ছিল তাঁহার উপর দণ্ড বিধান। আমরা সকলেই ত' ঐরূপ লীলা কতই দর্শন করিয়াছি। কিন্তু মনের মধ্যে বড় দুঃখ হয়, কোথায় আমাদের সেই নির্ভরশীলতার ভাব যাহা জাগাইবার জন্য তিনি এত চেষ্টা করিয়াছেন! 'বাবা' ছিলেন প্রত্যক্ষ-বাদী। সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা সাধারণের নিকট নিস্ফল মনে করিয়া কেবল বিশিষ্ট অধিকারীর ক্ষেত্রে তিনি ঐ আলোচনা নিবদ্ধ রাখিতেন।

প্রথম দর্শনের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দিব্য-স্পর্শ লাভ করিয়া তৃষিত প্রাণে অনেক খানি শান্তি অনুভব করিলাম। একদিন শুভ মুহূর্ত্তে ঐ শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল!

দীক্ষান্তে ঐ দিব্য-পুরুষকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম—

'যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব,
যদস্তি হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।'

এই অকিঞ্চনের জীবনে 'বাবার' কৃপা কিরূপভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উহাই বিষয় বস্তু। সাধকের ব্যক্তিগত গুহ্য আধ্যাত্মিক ভাবের ক্রমবিকাশ বিষয়ে কোনও রূপ আভাস দান আমার উদ্দেশ্য নহে—কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা-প্রসঙ্গই আলোচনার বিষয়।

আমার জননী সর্ব্বদাই আমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। আমার দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়া তিনি গুরুদেবকে আমার বিবাহ সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লাভও করিলেন। তারপর সে সম্বন্ধে আমাকে সব কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া আমি জননীর উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া নানারূপ বাক্-বিতণ্ডায় লিপ্ত হই। বিবাহের উপর বিতৃষ্ণা ও ভয় আমার চিরদিনই ছিল; কেবলই মনে হইত উহা সমস্ত বন্ধনের মূল কারণ ও পারমার্থিক উন্নতির বিষম অন্তরায়। মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া ত্যাগ ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইব, ইহাই ছিল আমার অন্তরের একমাত্র বাসনা। জননীর সহিত বাক্-বিতণ্ডার পর সারারাত্রি অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও দারুণ ক্রোধে কাটিয়া গেল। পরদিন বিকালে যখন বাবাকে দর্শন করিবার জন্য আশ্রমে যাই, তখন তিনি স্বয়ংই গত রাত্রিতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা

আমাকে বলিলেন, এবং ইহাও জানাইলেন যে তিনি উক্ত সময়ে আমাদের বাড়ীতে ছাদের উপর গিয়াছিলেন এবং সমস্ত বিষয় দেখিয়া আসিয়াছেন। ভয়ে অত্যন্ত কুন্ঠিত হইয়া আমি দুই একটি কথা নিবেদন করিতেই, তিনি অতি মৃদুস্বরে হাসিয়া কহিলেন যে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনই শাস্ত্রের বিধান এবং বিবাহ করাই তাঁহাদের মঠের বিধি। বিবাহ সম্বন্ধে বাবার সহিত পরে আমার কয়েকবারই পত্রালাপ হইয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"* * * সংসারে থাকিতে হইলে বিবাহের প্রয়োজন হয়, কারণ সকল রিপুকে সকল সময় ঠিক রাখা বড়ই শক্ত, তাহাতে আবার মায়ার প্রলোভন। অবশ্য যোগীদের কথা আলাহিদা; তাহা হইলেও তাঁহারা দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তোমাকে বেশী লেখা বাহুল্য। গুরু-জনের আজ্ঞা পালন করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা কোনও বিষয়ে মানসিক কষ্ট পাইলে বড়ই তাপ ভোগ করিতে হয়।"

দীক্ষার তিন চারি বৎসর পরে কি জানি কেন আমার মনে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, এবং বিবাহের সঙ্কল্প করিয়া গুরুদেবের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলাম। প্রথমে অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে জানাইলে, তিনি উহার উত্তরে বলিলেন—"* * * অসবর্ণ বিবাহ করিলে সপ্ত পুরুষ নরকে যায়, ও নিজকেও নরকে যাইতে হয়। শারীরিক ও মানসিক খুবই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমি অনেকের দেখেছি ও দেখ্‌ছি—ঐরূপ করিলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। এক ভাবে মনকে যাহাতে রাখিতে পার, তাহার চেষ্টা করিও।" বিবাহের উপযোগিতা

প্রসঙ্গে আর একবার আমি যখন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * যোগীর সাধনার মূল কেন্দ্রস্থল, এই সংসার। যে সংসারের এত আরামের মধ্যে থেকেও যোগাভ্যাস ক'রতে না পারে, সে বনে গিয়া কঠোরতার মধ্যে কি ক'রে পারবে? ভগবানের উদ্দেশ্য যদি এই হতো, যে সকল লোকই বাল্মীকির মত উইয়ের ঢিপি হ'য়ে বসে থাকবে, তা হ'লে জগতে এত জিনিষ দিবার কি দরকার ছিল? সব মানুষগুলো এক একটি ঢিপি হ'য়ে বসে থাকত। * * সংসারে সব জিনিষের মধ্যে (প্রলোভনের মধ্যে) থেকে, নিজের উন্নতির চেষ্টা করাই—তাঁর উদ্দেশ্য।" "* * * প্রকৃতিকে যে যে ভাবে নেবে, তার ফল সেই রকম পাবে। নারীর মধ্যে কোনও দোষ নাই—প্রকৃতি ত' সুধার আধার! মদের বোতল কি কখনও মাতাল হয়? জগতে সকলেই ত' সংসারের মধ্যে থেকে, সকল কাজ ক'রে এসেছে।" আমার প্রশ্ন ছিল—"নারীর মোহের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া কিরূপে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়।" এই প্রসঙ্গেই তিনি ঐ সব কথা লিখিয়াছিলেন।

দীক্ষা লাভের পর পাঁচ সাত বৎসর পর্য্যন্ত হৃদয়ে খুবই শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম—দারুণ পিপাসার পর শীতল জল পান করিলে যেরূপ তৃপ্তি মনে হয়, ঠিক যেন সেই ভাব। কিন্তু জানি না কেন ধীরে ধীরে পুনরায় হৃদয়ের মধ্যে এক শুষ্কতার ভাব আসতে লাগিল। এই সময় গুরুদেবের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল অমৃত-বাণী লাভ করিতাম, তাহা সাধক মাত্রেরই অনুধাবন যোগ্য। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—"* * * সব কাজের বেলায় সময় পাওয়া যায়, কিন্তু "ক্রিয়ার" প্রতি দৃষ্টি না

রাখিলে উন্নতি হইবে কি প্রকারে? একটি টাকা রোজগার করিতে হইলে কত খাটিতে হয়, একটু পড়া মুখস্থ করিতে হইলে কত পরিশ্রম করিতে হয়—আর জগতের মধ্যে সব চেয়ে এই বড় কাজটা, বিনা আয়াসে আয়ত্ত হইবে? মনকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না। ভাল করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পোষ মানাইতে হইবে। রোজ কাহাকেও যদি তাড়াইয়া দেওয়া যায়, সে কি আর তোমার কাছে কখনও ফিরিয়া আসে? সেই রকম চিন্তা গুলিও। স্থিরভাবে তাহাদের তাড়াইতে হইবে।" একবার তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—"বাবা! আপনি কৃপা করিয়া আমাদের মনকে উচ্চগামী করিয়া দিতে পারেন ত'; আমরা এত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছি না।" উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * বাহিরের শক্তি তোমার মনকে ভাল ক'রে দিতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তোমার উপকার স্থায়ী হবে না। নিজের চেষ্টায় নিজকে গড়ে তুলতে হবে।"

আর একবার তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * সাধন-জীবন আর সাধারণ কর্ম্ম-জীবনের জীবন-ধারার সহিত সামঞ্জস্য ধীরে ধীরে আপনিই হইয়া যাইবে, যদি 'ক্রিয়া'র সময় ঠিক মত কাজ কর। 'ক্রিয়া'র সময়টুকুতে ভাল করিয়া 'ক্রিয়া' করিতে হইবে। ......ভাল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইতে হইলে সেই বিষয়ে তীব্রভাবে আলোচনা বা চিন্তা করা দরকার। খারাপ পরমাণুগুলি এখন তোমার মধ্যে খুব প্রবল আছে বলিয়া ভাল বিষয়ের পরমাণু আসিতে পারিতেছে না। **তীব্র সংঘর্ষের দ্বারা খারাপ পরমাণুগুলি পরাজিত হইবে।** পূর্ব্বেকার সংস্কারগুলি

এখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে তোমার মধ্যে রহিয়াছে। **মনটাকে কখনও বিচলিত হইতে দিবে না।**" 'ক্রিয়া' ভাল হইতেছে না কেন, এই বিষয়ে একবার তাঁহাকে লিখাতে তিনি উত্তর দেন—"* * * তোমরা কি ভাবে 'ক্রিয়া' কর, বা অন্য যে সকল কার্য্য কর, বা না কর—সবই আমি নিজে দেখি। ক্লান্ত হ'য়ে গেছি ব'লে, আসনে পর্য্যন্ত না ব'সে, কোনও রকমে কাজটা নিয়ম রক্ষার মত সারাটাতেও আমার খবর থাকে।" শরীর অত্যন্ত খারাপ থাকার দরুণ আমি কয়েকদিন ঠিকভাবে আসন করিয়া 'ক্রিয়া' করিতে পারি নাই। সেই সময়ে বাবা উপরোক্ত পত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন। আমি একবার তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—"আপনি যখন সবই দেখেন ও জানিতে পারেন, তখন কেন আমাদিগকে নিয়া এত খেলান?" ইহার উত্তরে বাবা লিখেন—"* * * আমি শুধু দেখি, তোমাদের কতটা দৌড়, তাহা। আমি ছেড়ে রেখেছি। তবে, যখন অতিরিক্ত হ'তে থাকবে, তখনই তীব্র আঘাতের দ্বারা চৈতন্য সঞ্চার করে দেবো। এই কথা বেশ উপলব্ধি করবে এক সময়ে।" জীবন-যাত্রার পথে নিরন্তরই ত ভুলের দিকে চলিয়াছি, কিন্তু পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি কে যেন হাত ধরিয়া অসত্য হইতে সত্যের পথে লইয়া গেলেন। এইখানেই ত' সদ্গুরুর প্রকৃত লীলার যথার্থ পরিচয়!

বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মন্দ কার্য্য কাহাকে বলে?" উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * যে কাজটা সকলের সামনে করতে লজ্জা বোধ হয় তাহাই খারাপ। আমরা কি জানি না যে কোন্ কাজটা খারাপ?

কিন্তু, জেনে শুনেও নিয়ত খারাপ কাজই করছি। নিজের খারাপ কাজকে সমর্থন করবার জন্য মানুষ নিজের বুদ্ধিকে কত রকমেই না যুক্তির দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা ক'রে থাকে……।" আমার মন যখন খুব খারাপ থাকিত, বাবাকে একবার লিখিয়াছিলাম—"আমার প্রাণে সুখ নাই, জীবনে আনন্দ নাই, হৃদয় যেন শুষ্ক মরুস্থান; সবই আছে, অথচ আসল বস্তু—আনন্দ—নাই।" উত্তরে তিনি লিখেন—"* * * 'ক্রিয়া' ঠিক ভাবে আদেশ মত করিলে, নিশ্চয়ই আশাতীত ফল পাওয়া যাইবেই য্যইবে। অশান্তি সমস্ত শান্তিতে পরিণত হইবে। কার্য্য না করিলে ফলের আশা কোথায়? চন্দন-কাষ্ঠ ঘাড়ে করিয়া বেড়াইলে সৌগন্ধ পাওয়া যায় না জানিতে হইবে। তিল দেখিয়া তৈলের অনুভব হয় না, উহাকে পেষণ করিলেই তৈল বাহির হয়। বৃথা সময় নষ্ট কেন কর?"

সেই পরম-পুরুষের শ্রীমুখ হইতে যে সকল বিশুদ্ধ-বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল উহাদের প্রচার ও প্রকাশ আমাদের মধ্যে যত অধিক হইবে, আমরা তাঁহার দিব্য-স্পর্শ তত অধিক নিবিড়ভাবে অনুভব করিব। তিনি আজ লৌকিক দৃষ্টিতে বিদেহী হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের কাছে এখনও প্রাণবন্ত হইয়া আছেন ও চিরদিনই ঐরূপ ভাবে থাকিবেন,–যদি আমরা আমাদের হৃদয়-দুয়াঁর তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিতে পারি!

"বৃথা চিন্তা করিও না—আমি আছি"—ইহাই হইল আমাদের নিকট তাঁহার অমোঘ অভয়-বাণী। কথা প্রসঙ্গে বাবা আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন—"* * * যদি কোনও

গুহ্য প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে 'ক্রিয়া'র অব্যবহিত পরেই, আমার নিকট উহা নিবেদন করিবে। মৌখিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।" আমি বহু সমস্যার মীমাংসা এইরূপ রহস্যজনক ভাবেই লাভ করিয়াছি। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * ভগবান্ যে উপাদানে প্রস্তুত, উহাকেও বিজ্ঞান দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। **ভগবান্ প্রস্তুত হইয়াছেন সেই মহাশক্তি হইতে।** এই মহাশক্তিকে কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ নারায়ণী বলিয়া থাকে। তাঁহারই খেলা চলিতেছে। পুরুষের নিজের কোনও শক্তি নাই প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে।" বিভূতির খেলা দেখিয়া প্রকৃত নির্ভরশীলতার ভাব আমাদের মনে আসিতে পারে কি না এই বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লিখেন—"* * * মনে কর কেবল এই সকল খেলা দেখলেই বিশ্বাস জন্মাবে? তা কখনও নয়; সহজে উহা হইবার নয়। **উপাদান প্রথমে প্রস্তুত করা আবশ্যক।** গুরুর কার্য্যই সেই উপাদান প্রস্তুত করা।" সাধনার অন্তরায়গুলি আমরা কিরূপে দূর করিতে পারি এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * 'ক্রিয়া' করিতে করিতে যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে উহা দ্বারাই সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে। 'ক্রিয়া' যত অধিক করিবে তত অধিক ফল পাইবে। **সব সময়েই স্মরণ করিবে।** নানা কাজে চিত্ত লিপ্ত থাকে বলিয়াই, উহার বিক্ষিপ্ততা জন্মে; ঠিক কেন্দ্রী করার নামই একাগ্রতা।"

সাংসারিক উন্নতি আর 'ক্রিয়া' একই সঙ্গে চলিতে পারে কিনা, এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—"* * * হ্যাঁ, পারে। এক দিক্

ভাল হইলে, সব দিক্ ভাল হইয়া যায়। ধর্ম্মকে ঠিকভাবে গঠন করিতে পারিলে, অন্যান্য পার্থিব জিনিষগুলি আপনিই হইয়া যাইবে।" ধর্ম্মের ভিত্তি কি, এই বিষয়ে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন—"তাঁকে জানবার চেষ্টা। সংসারে যাবতীয় বস্তু ভগবান্ দিয়াছেন **পার্থিব ভালবাসার মধ্য দিয়া তাঁকেই ভালবাসার জন্য।** কষ্ট কেন হচ্ছে এই কথার উত্তর মানুষ যদি খোঁজে তা হ'লে শান্তি নিশ্চয়ই আসবে। মানুষ কেবল অন্যের দোষ অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়, গুণের দিক্‌টা অন্বেষণ করে না। যাকে বিশ্বাস করবে, তার সঙ্গে আগে ব্যবহার করা খুবই আবশ্যক। তা' না হ'লে প্রতারিত হ'তে হয়।" আমাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা কিরূপে দূর করা যাইতে পারে, এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * যদি তুমি যোগ-ক্রিয়া শিখ তা হ'লে তোমাকে অর্থের জন্য ভাবতে হবে না, অর্থ তোমার কাছে আপনিই আস্‌বে। চেষ্টা কর ; অত জিনিষ চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য্য হ'য়েছ, এতেও যদি চেষ্টা কর কৃতকার্য্য কেন না হবে?" শ্রীশ্রীবাবাকে আমার লিখিত শেষ পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—**"মানুষের মুক্তিলাভ কিরূপে হইতে পারে?"** উত্তরে অত্যন্ত জোরের সহিত তিনি লিখিয়াছিলেন—"* * * অতৃপ্তি ও ঋণ লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। যে প্রণালীতে মানবের স্থূল ভাব কাটিয়া যায় তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সংঘর্ষণ ভিন্ন এই স্থূল নাশের দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই।" মানুষের জীবনের দুঃখ ও সুখভোগ এবং তাহার ক্রমোন্নতির মূল কারণ হইতেছে তাহার কর্ম্ম। সেইজন্য

বাবা কেবলই আমাদের বলিতেন—"কর্ম্মভ্যো নমঃ"। কর্ম্মের মধ্যে শান্তি ও সাফল্য লাভ করিবার জন্য 'উপযুক্ত কৌশল' অবলম্বন আবশ্যক। সদ্‌গুরু ঐ কৌশল দেখাইয়া দিয়া আশ্রিতকে সত্য ও মঙ্গলের পথে লইয়া যান। শোক, তাপ ও অভাবের তাড়নায় বিভ্রান্তগণের প্রতি তাঁহার বাণী—"* * * বাপু, সবই নিজের কর্ম্মের ফল, সেই কর্ম্ম আর বাড়াইও না। কেবল দুঃখটুকুই দেখ, কিন্তু কত রাশি রাশি দুষ্কৃতির ভোগ ঐ দুঃখটুকুতেই কাটিয়া যাইতেছে তাহা ত' দেখ না। দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, আর নূতন কষ্টের সৃষ্টি হইবে না। * * হাঁ, মনের ধর্ম্মে সময় সময় দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবে বই কি ? কিন্তু মনের বলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দমন করা উচিত, তাহাকে প্রশ্রয় দিলেই সে বিপদ ঘটাইবে।"

(২)

বাবা বলিতেন—"প্রকৃত যোগীই ঈশ্বর, ঈশ্বরই যোগী"। ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বক্রিয়ত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব, ইহাই প্রকৃত যোগীর যথার্থ পরিচয়। বাবার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যে আমরা সকলেই তাঁহার উক্তরূপ ঐশীশক্তির প্রকাশ বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন—"* * * প্রকৃত যোগী সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যোগ-যুক্ত থাকেন বলিয়া, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা যে কোনও স্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারেন। ভক্তের আর্ত্তধ্বনি তাঁহার সেই সত্তাকে আবির্ভূত করায়। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের নিকট রহিয়াছি। তোমরা 'ক্রিয়া'তে উন্নত হইলে, ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে।"

বাবা সর্ব্বদাই সেই অনন্ত-শক্তির উৎসের সহিত যুক্তাবস্থায় অবস্থান করিতেন। সেইজন্য তাঁহার লীলা ব্যাপকভাবে আমরা তখন অনুভব করিতাম এবং এখনও করিতেছি। তাঁহার ঐ লীলা অফুরন্ত; আশ্রিতের জীবনের স্তরে স্তরে আজিও উহার প্রকাশ! তিনি ছিলেন এক পরম রহস্যময় অলোক-সামান্য মহাপুরুষ। তিনি কখনও নিজকে প্রচার করিতেন না। 'মানুষ' যে কখনও 'ভগবান্' হইতে পারে—ইহা কখনও স্বীকার করিতেন না; বলিতেন—"* * * জীব কি কখনও ঈশ্বর হয় গো? জীব চিরদিন জীবই থাকে।"

দীক্ষার সময় তিনি প্রত্যেক শিষ্যকে একটি করিয়া মহামূল্যবান্ কবচ দান করিতেন। ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শরীরে ধারণ করিতে হয়। কয়েকটি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এই কবচের গুণ নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বাবা বলিতেন যে এই কবচ যতদিন অবিকৃতভাবে দেহে ধারণ করা যায় ততদিন কাহারও অপমৃত্যু অসম্ভব। দীক্ষান্তে এই কবচ ধারণ করার পর বাবার কথার সত্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কলিকাতার জনবহুল স্থান চৌরঙ্গীতে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় অত্যন্ত ভীড় হয়। একদিন ঐ সময়ে সেখানকার চৌরাস্তার প্রহরীর নিষেধ সত্ত্বেও চৌমাথায় আসিয়া আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ি। যান-বাহনের স্রোত ঐ সময়ে অধিক ছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিক্ হইতে আট দশখানি মোটর গাড়ী আমার নিকট হইতে প্রায় এক গজের ব্যবধানে আসিয়া থামিয়া গেল। পুলিশ প্রহরী যদি না থাকিত, তাহা হইলে উহারা

আমাকে চাপা দিয়াই চলিয়া যাইত। বৃথা যান-বাহনের স্রোত রোধ করিবার অপরাধে আমাকে থানায় লইয়া যাইবার জন্য প্রহরী আমার হাত ধরিল। আমি তাহার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া কেবলমাত্র দুই একটি কথা কহিয়া 'জয়গুরু' বলিয়া ঐ স্থান হইতে সরিয়া আসিলাম। কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিয়া পুলিশ আমাকে নিস্তার দিল। এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে বাবার দর্শনের জন্য তাঁহার নিকট যাইলে তিনি নিজেই আমাকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং তিরস্কার করিয়া কহিলেন—"তোমাদের ঐরূপ কার্য্যের জন্য আমাকে বড় ব্যস্ত হইতে হয়। মিছামিছি ঐরূপ কাজ করা উচিত নয়।" কলিকাতায় একবার যখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইতেছিল, সেই সময় অত্যন্ত উত্তেজনা ও ভীতির মধ্যেও আমি শ্যামবাজার হইতে ভবানীপুরে বাবাকে দর্শন করিবার জন্য যাইতাম। জগুবাবুর বাজারের নিকট তখন Machine gun বসান হইয়াছিল। সারা শহরে গোলযোগ এত অধিক হইয়াছিল যে আমাদের সকলকে নিজ বাসস্থান রক্ষা করিবার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। মুসলমান-পাড়া অতিক্রম না করিয়া আমাদের বাড়ীর বাহিরে যাইবার অন্য সুবিধাজনক পথ ছিল না। একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পথ দিয়া চলিতেছি, হঠাৎ চারি পাঁচ জন দুর্বৃত্ত মুসলমান আসিয়া, আমাকে ছোরার দ্বারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা নিকটে আসিলে আমি ভয়ে 'জয়গুরু' বলিয়া চীৎকার করিতেই তাহারা আপোষের মধ্যে দুই একটি কথা বলিয়া অন্য পথে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কাশীতে একবার ঠিক

ঐরূপ ভাবে কয়েকজন দুর্বৃত্তের তরবারি হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম। বাবা তাঁহার শিষ্যগণকে কি প্রকারে নিজের রক্ত দিয়া রক্ষা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত বহুবার আমরা দেখিয়াছি। তিনি আশ্রিতগণকে কিরূপ গভীরভাবে স্নেহ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাদের আধি-ব্যাধি নিজের দেহে আকর্ষণ করিয়া ঐ সকল কষ্ট ভোগ করাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইরূপ দেখিয়া তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি কহিতেন—"গুরুর রক্তের প্রতি ফোঁটাই শিষ্যের কল্যাণের জন্য"। তাঁহার এই উক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালে দেহরক্ষার একমাত্র কারণই ছিল জনৈক ভক্তের ব্যাধি আকর্ষণ। দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"বিষের যে এত জ্বালা তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।" মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি এখন যাইব না।" কিন্তু করুণার সাগর কাহার উপর করুণা করিয়া নিজের দেহকে তাহার মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের সকলকে ভাসাইয়া দিলেন, 'এই' রহস্যের উদ্ঘাটন কে করিবে?

এক সময় আমার বাম চক্ষুর কয়েকটি শিরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল (choriditis)। এইজন্য ঐ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। প্রায় এক বৎসর বহু প্রকার চিকিৎসা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই উপকার অনুভব করিতেছিলাম না। এই কারণে আমি কিছুদিন

হইতে 'ক্রিয়া' বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভয় ও লজ্জায় এই সকল বিষয় বাবার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ ছয় মাস এইরূপ ভাবে চলিবার পর হঠাৎ বাবা একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি 'ক্রিয়াদি' কেন বন্ধ করিয়া দিয়াছি। সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলাতে তিনি সস্নেহে আমাকে কহিলেন—"তবে তোমার এই চোখটি অন্ধ হয়ে যাবে কি?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর আমি উত্তর দিলাম—"আপনার কৃপা হ'লেই আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।" বাবা বলিলেন—"আচ্ছা, দেখা যাক্।" এই ঘটনার পাঁচ ছয় দিন পর হইতেই আমার ঐ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় সতেজ হইয়া আসিতে লাগিল এবং আজ পর্য্যন্ত উহা প্রায় স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে।

বাবা তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও হৃদ্‌যন্ত্রের দৌর্ব্বল্যের জন্য চিকিৎসকগণ আশ্রমের সিঁড়ি হইতে তাঁহাকে নামা-উঠা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য বাবা যখন নীচের তলায় আসিতেন, Invalid chair এ করিয়া তাঁহাকে নামান উঠান হইত। এই সময় একদিন বিকাল বেলায় আমি ও দুই একজন শিষ্য তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম, তখন তিনি উপরে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমাদের তিনি বলিলেন—"কিগো, তোমরা আমাকে উপরে নিয়ে যেতে পারবে না কি?" সেখানে তখন অপর যে দুইজন লোক ছিলেন তাঁহারা উভয়েই বৃদ্ধ। আমারও দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে তখন খুব একটা বেদনা ছিল।

চারিজন লোক না হইলে তাঁহাকে উপরে উঠান অসম্ভব, এই কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি আমাকে পরমেশ্বর ভৃত্যকে ডাকিতে বলিলেন এবং কহিলেন "তোমরা দুইজনেই ঠিক পারবে। আমার জন্য কোন ভয় নাই।" কিন্তু পরমেশ্বরেরও পায়ে কিছু দোষ ছিল, সে সোজা হইয়া চলিতে পারিত না। যাহা হউক, বাবার আজ্ঞা মত আমরা দুইজনে 'জয়গুরু' বলিয়া অনায়াসে তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইলাম। মনে হইতেছিল যেন আমরা একটি চারি-পাঁচ বৎসরের শিশুকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছি। বাবা উপরে উঠিয়া গিয়া খুব হাসিয়া বলিলেন—"কিরে বাপু, খুব কষ্ট হ'লো নাকি?"

কাশী দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন আমি বাবাকে প্রণাম করিবার জন্য আশ্রমে যাই। অভিপ্রায় ছিল, পরদিন আশ্রমে যাইব না, কারণ রাস্তায় রংএর জন্য বড় বিব্রত হইবার আশঙ্কা ছিল। প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় বাবা আমাকে মৃদুস্বরে কহিলেন—"কিগো, কাল দোলের দিন আশ্রমে আস্‌ছ ত'? এখানে প্রসাদ পাবে।" আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে হাঁ, আসব।" পরদিন সকালেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামান্য দূর অগ্রসর হইতেই পথের ছেলেরা লাল রং দিয়া আমার সমস্ত কাপড়-জামা ও শরীর সিক্ত করিয়া দিল। ঐরূপ ভিজা কাপড় জামাতেই আমি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাবাকে দর্শন করিলাম। বাবা আমাকে দেখিয়া খুব হাসিলেন। দেখিলাম আশ্রমের গুরু-ভাইগণ বাবার শ্রীচরণে আবীর ও কুঙ্কুম দিয়া প্রণাম করিতেছেন। আমার কাছে

উহা ছিল না, আমি চুপ করিয়া বারান্দার এক প্রান্তে গিয়া বসিলাম। একখানি আরাম চেয়ারে বাবা উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার পদতলে একখানি ছোট গালিচার আসন পাতা ছিল। দেখিলাম আবীরের দ্বারা উহা কেবলই ভরিয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ পরে আর একজন অভ্যাগত আসিয়া বাবার পায়ে আবীর লাগাইয়া প্রণাম করিলেন। বাবা তাঁহাকে অতি কোমল ভাবে বলিলেন—"তোমরা আবীর দিয়ে ঠাকুরদের প্রণাম ক'রে আস্‌ছ না কেন?" কিছুক্ষণ পরে আসনখানির অবস্থা দেখিয়া আমি বাবাকে বলিলাম যে উহা নীচে লইয়া গিয়া ঝাড়িয়া আনিতে পারি কি না। ইঙ্গিতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমি অতি সন্তর্পণে আসনখানি উঠাইয়া আশ্রমের পূর্ব্বদিক্‌স্থ নীচের সিঁড়ির নিকট লইয়া গিয়া ঝাড়িতে লাগিলাম। উহার মধ্য হইতে এত ধূলি ও আবীর বাহির হইল যে আমার শ্বাস বন্ধ হইবার মত মনে হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দেহের মধ্যে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত দেহে এক প্রকার স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম এবং দুই চক্ষু হইতে বিগলিত ধারায় অশ্রু নিঃসরণ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল আমি যেন কি এক আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি—একেবারে বিহ্বল হইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেমন এক অপূর্ব্ব আনন্দ-ভাব—শিহরণ, প্রেম-সুধারসের আস্বাদন—আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। সেখানে তখন কেহই ছিল না, কিন্তু কে যেন বেশ স্পষ্টস্বরে আমাকে বলিল—"এই

ধূলিই ত' শ্রীকৃষ্ণের পদ-রজ, বৃন্দাবনের দোল-লীলা—কত মধুর !" আমি গদগদ ভাবে কেবলই কাঁদিতে লাগিলাম এবং পাছে এই বিহ্বল-অবস্থা কেহ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে উপরে উঠিবার সিঁড়ির নীচে এক কোণে গিয়া আশ্রয় লইলাম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলাম জানি না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার পর আসনখানি উপরে লইয়া গিয়া বাবার পদতলে পুনরায় রাখিয়া দিয়া প্রণাম করিলাম। বাবা আমাকে দেখিয়া কহিলেন—"এতক্ষণ নীচে কি হচ্ছিল ? ঐ রকমই হয় গো !" বুঝিলাম, তিনি না জানালে কেহই জানিতে পারে না। কি মধুর ঐ পরশ !

একবার কাশীর আশ্রমের কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য কিছু অর্থের অনটন ঘটে। হঠাৎ প্রয়োজন ঘটাতে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ দাদা মহাশয় একদিন বিকালে নিজ হইতেই নির্দ্দিষ্ট টাকা লইয়া আসিয়া বাবার নিকট উহা অর্পণ করিলেন। বাবা তখন বলিলেন—"আশ্রমের যাহা কিছু কাজ সকল শিষ্যের মঙ্গলের জন্য। যাহাতে সকলের ঐকান্তিকতা নাই উহা না হওয়াই ভাল। একজনের নিকট হইতে সমস্ত অর্থ নিয়া আশ্রমের কোনও কাজ হওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি ঐ অর্থ প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিনীতভাবে বাবাকে বলিলেন যে, তিনি এই অর্থ বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন না—বাবা অন্য যে কোনও কার্য্যে উহা লাগাইয়া দিতে পারেন। বাবা কহিলেন—"তবে

তোমার এই টাকা জ্ঞানগঞ্জে ভৈরবী-মাতাদের কাছে পাঠান যাইতে পারে, তাঁহারা যা' ভাল মনে করেন করিবেন।" ইহার পর বাবা ঐ নোটগুলি একখানি নূতন সাদা কাগজের মধ্যে ভরিয়া চারিদিকে শক্ত করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিবার জন্য কবিরাজ মহাশয়কে দিলেন। তখন তাহাই করা হইল। তার পর বাবা ঐ টাকার মোড়কটি কবিরাজ মহাশয়কে নিজের গাত্রস্থ চাদরের এক প্রান্তে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিতে বলিলেন এবং কহিলেন ঐ মোড়কটি মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের সকলের সম্মুখেই (সেখানে আমরা তখন প্রায় আট দশ জন উপস্থিত ছিলাম এবং বেলা পাঁচটা ছিল) জ্ঞানগঞ্জে পাঠাইবেন এবং যদি তাঁহারা ঐ অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ কাগজের মোড়কের উপর একটি তৈলাক্ত দিব্য গন্ধ লাগাইয়া দিবেন। কবিরাজ মহাশয় বাবার আজ্ঞামত তাঁহার চাদরের প্রান্তে বাঁধা মোড়কটি নিজের হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিলেন। বাবা কিন্তু নিকটে একখানি আরাম-চেয়ারে সব সময়েই বসিয়াছিলেন। তিনি চেয়ারের হাতলের উপর দুইবার মাত্র আঘাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কবিরাজ মহাশয়কে হস্তস্থিত চাদরে বাঁধা মোড়কটি বাহির করিতে বলিলেন। আমরা সকলেই দেখিলাম যে মোড়কটি সূতা দিয়া পূর্ব্ববৎ শক্ত ভাবেই বাঁধা আছে অথচ উহার মধ্যে নোটগুলি নাই এবং কাগজের মোড়কটির উপর অতি সুগন্ধ-যুক্ত তৈলের একটি দাগ রহিয়াছে। ইহা আমরা সকলেই দেখিলাম ও আঘ্রাণ করিলাম। বাবা কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন যে ভৈরবী মাতারা ঐ টাকা গ্রহণ

করিয়াছেন, এবং তাঁহারই মঙ্গলার্থে উহা কোন কাজে লাগাইয়া দিবেন। সুতা-বাঁধা ঐ মোড়কটি কবিরাজ মহাশয় বাড়ী লইয়া যাইলেন। ইহা দেখিয়া আমরা সকলে ধন্য মনে করিলাম।* আশ্রমের কোনও কার্য্যে শিষ্য ব্যতীত বাহিরের কাহারও নিকট হইতে কোনও দান গ্রহণ করা বাবার নিয়ম ছিল না। এখনও সেই নিয়ম পালন করা হইতেছে।

* এই ঘটনাটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমি ইহার বিবরণ নিজে কোথাও প্রকাশিত করি নাই। এখনও করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে। "যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" নামক গ্রন্থে এই ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (পৃঃ ৭০৮) তাহা গুরুভাই কবিরাজ শ্রীমুনীন্দ্রমোহন দে দাদার নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই বিবরণে ভুল আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীসুবোধ দাদা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও ভুল আছে। ইঁহারা উভয়েই সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলেও সঠিক ভাবে ঘটনার বর্ণনা দিতে পারেন নাই, ঘটনাটির মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন মাত্র।

এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের অপরাহ্ন কালে ৺কাশীধাম মালদহিয়াস্থিত শ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমের বিজ্ঞান-মন্দিরের দোতলার পূর্ব্বদিক্‌কার বারান্দাতে। এই বারান্দার দক্ষিণদিক্ ঘেসিয়া পশ্চিম পার্শ্বে একটি আরামকেদারা পাতা থাকিত। শ্রীশ্রীগুরুদেব বৈকাল বেলা ঐ কেদারা হেলান দিয়া উপবেশন করিতেন। শেষদিকে কয়েক বৎসর শরীর অসুস্থ থাকা কালে পূর্ব্বের ন্যায় নীচের হলে যাইয়া বসিতেন না। দর্শনার্থী শিষ্যবর্গ ঐ বারান্দাতেই এদিকে ওদিকে তাঁহার শ্রীচরণ-সন্নিধানে বসিত। ৺নবমুণ্ডী আসন ১৯৬৫ সালে অর্থাৎ

একবার শিবরাত্রির উৎসবে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়া বাবার দর্শন করি। এই দিন আমাদের যে

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও উহার আনুষঙ্গিক অনেক রচনাত্মক ও উপকরণাত্মক কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছে। বেদী ও আসনের পশ্চিমদিকে যে ঘরটি আছে (গুহার উপরি তলাতে) ঐটিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের কর্ম্মী শিষ্যসহ বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেবদেবীর অতি সুন্দর চিত্রাবলী দ্বারা প্রাচীর শোভিত হইয়াছিল। নীচে সতরঞ্চি ও চাদর বিছানো হইয়াছিল। গুরুদেবের জন্য নূতন পালঙ্ক নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তাহার উপর বিশেষ উপাদানে ও প্রণালীতে প্রস্তুত গদ্দা ও বালিস তৈয়ার হইয়াছিল। উহাতে সাধারণ তুলার পরিবর্ত্তে আকন্দের তুলা ভরা হইয়াছিল। খোলের জন্য সাধারণ সূত্রের ব্যবহার করা হয় নাই—তাহার বদলে রেশম বা পট্টসূত্রের ব্যবহার করা হইয়াছিল। যাঁহারা ৺নবমুণ্ডীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাঁহারা ঐ আসন গুহাদি রচনার যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ হইতেই এই কার্য্য হইয়াছিল। আপাততঃ সব কাজই প্রায় শেষ হইয়াছিল। শুধু বিশুদ্ধ রেশমী আস্তরণের অভাব ছিল। সংগৃহীত অর্থে সঙ্কুলান হয় নাই। এই সব রচনা ও ব্যবস্থার ভার ছিল আমাদের গুরুভ্রাতা ডাক্তার শোভারাম মেহতা দাদার উপর। তিনি বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত, সেবক ও কর্ম্মকুশল শিষ্য ছিলেন। বাবার কলিকাতা যাওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে জানিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কার্য্যটি শেষ করিয়া, সম্ভবপর হইলে একবারের জন্যও, যাহাতে বাবাকে ঐ স্থানে বসান যায় তাহার তীব্র ইচ্ছাতে কার্য্যটি যথাশীঘ্র সমাপ্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী বিকালে দাদা আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলেন—"দাদা, আসনের প্রধান প্রধান কার্য্য ত শেষ হইয়া আসিল। গুহার আবশ্যকীয় কাজও শীঘ্রই শেষ হইবে।

নির্জ্জলা উপবাস বিধি তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল। দুই তিনটি পাতিলেবুর রস পান করিয়া আমি ঐ উৎসবে যোগদান করি। বাবাকে দর্শন করিবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সাঁদা কম্বলের ব্যবস্থাও হইয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যেই আশা করি সব সম্পূর্ণ হইবে। এখন ভাল রেশমের চারিখানা আস্তরণ (চাদর) আবশ্যক। ইহার মূল্য যাহা লাগে আপনি দিবেন।" দাদার কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত দিতে হইবে? যাহা আবশ্যক হয় কাল দিব।" তিনি বলিলেন—"বোধ হয় এক একখানা চাদরের দাম কুড়ি টাকা হইবে। তদনুসারে আপনি আশি টাকা, অর্থাৎ চারিখানা চাদরের দাম, নিয়া আসিবেন।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে পরদিন ঐ টাকা আমি তাঁহাকে দিব, বিলম্ব হইবে না। তদনুসারে আমি পরদিন বৈকালবেলা দশ টাকার আটখানা নোট শোভারাম দাদাকে দিবার জন্য নিয়া আসি। তখন বাবা বিজ্ঞান মন্দিরের বারান্দাতে বসিয়াছিলেন, আমরাও নিকটেই বসিয়াছিলাম। আটটি নোট একটি ভাল সাদা খামে পুরিয়া আমি আনিয়াছিলাম। উহা বাহির করিয়া শোভারাম দাদাকে দিতেই বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহা কি?" তখন আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানাইয়া উহা আরাম কেদারার হ্যাণ্ডেলের উপর বাবাব নিকট রাখিলাম ও বলিলাম, "ইহা শোভারাম দাদাকে দিতে হইবে—নবমুণ্ডীর ঘরের চাদরের দাম।" বাবা বলিবেন—"কত টাকা?" আমি বলিলাম—"আশি টাকা"। বাবা শুনিয়াই একটু চমকিত হইলেন। বলিলেন—"এ কি? চাদরের দাম আশি টাকা?" শোভারাম দাদার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত টাকা কেন?" শোভারাম দাদা বলিলেন—"চারিখানা চাদরের দাম—প্রতি চাদর কুড়ি টাকা।" শুনিয়াই বাবা একটু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা! চারিখানা চাদরের কোন প্রয়োজন নাই। একখানা চাদরেই কাজ চলিবে।" এই

"কিগো, উপবাস করেছ কি ? তবে বাপু, পাতিলেবুর রস খেলে শিবরাত্রির ব্রতের উপবাস হয় না। রাত্রিতে আজ আহার করবে নিশ্চয়ই।" আমি একটি ক্যামেরা সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমানে গিয়াছিলাম। বাবার একখানি ছবি তুলিবার খুবই ইচ্ছা ছিল। বাবা জানিতেন না যে আমার নিকট ঐ যন্ত্রটি আছে। পরদিন

বলিয়া ঐ টাকার মধ্য হইতে কুড়ি টাকা অর্থাৎ দুইখানা নোট শোভারাম দাদাকে দিলেন। বাকী ষাট টাকার ছয়খানা নোট খামসহ আমাকে ফেরত দিলেন। আমাকে বলিলেন—"এ টাকা তুমি ফেরত নাও। অর্থের বৃথা ব্যয় করিতে নাই।" আমি কিন্তু ঐ টাকা ফেরত লইতে সম্মত হইলাম না। কারণ আমি উহা একটি শুভ সঙ্কল্পের পূরণার্থ আনিয়াছিলাম। উহা শুভকার্য্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাই বাবাকে নিবেদন করিলাম—"আমি উহা ফেরত নিব না। যদি উহা শোভারাম দাদাকে না দেন তবে উহা আপনিই কোন শুভ কার্য্যে লাগাইয়া দিন।" বাবা বলিলেন—"তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? উপরওয়ালারা তা হ'লে আমাকে দণ্ড দিবেন। আমি উহা নিতে পারি না।" বাবা উহা নিলেন না, দাদাকেও দিলেন না, আমিও নিলাম না। দুই চারি মিনিট পরে বাবা আমাকে বলিলেন—"তুমি যদি বল তা হ'লে আমি জ্ঞানগঞ্জে জিজ্ঞাসা করি।" আমি বলিলাম, "তাই করুন।" ইহার পরে তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া পূজার ঘরে একাকী ঢুকিলেন ও তিন চারি মিনিটেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"উমা ভৈরবী মা ঐ টাকা গ্রহণ করিবেন। তিনি উহা তোমার হাত হইতেই নিবেন।" এই বলিয়া আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ, তুমি ঐ নোট কয়েকখানা খামের মধ্যে বন্ধ করিয়া নিজের কাপড় দ্বারা ভাল করিয়া আচ্ছাদন কর ও নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখ। তিনি তোমার হাত হইতেই উহা গ্রহণ করিবেন।" আমি বাবার আদেশানুসারে ছয়খানা নোটই সাদা খামের মধ্যে পুরিয়া

প্রায় সন্ধ্যার সময় বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কিগো, আমার ছবি তুলবে না ?" আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—"অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি ভাবে তুলবো ?" (ছবি তোলার বিষয়ে আমি তখনও অনভিজ্ঞ ছিলাম) বাবা বলিলেন—"এই ঘরের মধ্যেই হবে।" তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, ঘরের অন্ধকারের মধ্যেই বাবার আজ্ঞা মত ক্যামেরা ব্যবহার করিলাম। তবে, অত্যন্ত ভয়ের সহিতই ছবি তুলিলাম—দৃঢ় আশঙ্কা ছিল

ঐ খামখানা আমার গাত্রবস্ত্র অর্থাৎ শীতবস্ত্র বা রেপার দ্বারা জড়াইয়া নিজের মুঠের মধ্যে ধরিয়া রাখিলাম। বলা বাহুল্য, যে সাদা খামে ভরিয়া নোটগুলি আমি আনিয়াছিলাম সে খামখানা আমার কাছেই ছিল—আমি ঐ খামে পুনবায় নোটগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ রাখার পর বাবা যে ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলেন উহার দক্ষিণ বাহুতে মৃদুমন্দভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"অনুভব করিতে চেষ্টা কর—কোন স্পন্দন উপলব্ধি করিতে পার কি না লক্ষ্য কর।" ইহার পর আমি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সূক্ষ্মভাবে অনুভবের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, কারণ বিশেষ অনুধাবন করিয়াও কোন স্পন্দন অনুভব করিতে পারি নাই। আমি বাবাকে সেইরূপই বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"তুমি বুঝিতে পার নাই, কিন্তু তোমার হাত হইতে জ্ঞানগঞ্জের উমা ভৈরবী মা ঐ নোট কয়খানা লইয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিবার পর আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শীতবস্ত্রের পুট খুলিয়া নিজের দুটি হস্তের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে সাদা খামটি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে, তাহা খোলা পর্য্যন্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার মধ্যস্থিত নোটগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। যিনি ঐ নোটগুলি টানিয়া নিয়াছেন তাঁহার দুই আঙ্গুলের রেখা পর্য্যন্ত খামের উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। খামের এক পৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠ ও অপর পৃষ্ঠে

যে 'প্লেটে' একটি চিহ্নমাত্র উঠিবে না। কলিকাতায় লইয়া আসিয়া 'প্লেট'খানি develop করিয়া দেখিলাম যে বাবার ছবিখানি খুবই সুন্দর উঠিয়াছে। বাবার জন্মোৎসবের সময় এই ছবিখানি গুরু-ভাইদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলাম।

আমার ভগিনীপতির কলিকাতায় বেশ বড় ও পুরাতন ব্যবসায় ছিল, এবং উহা তিনি একাই পরিচালনা করিতেন। তিনি একবার অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায়, দীর্ঘকালের জন্য তাঁহাকে বিদেশে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজন অসাধু ব্যক্তি ব্যবসায়-সংক্রান্ত অত্যন্ত আবশ্যকীয় দুই তিন খানি হিসাব-খাতা লইয়া পলাইয়া যায় এবং উহার সাহায্যে দোকানের পাওনাদারদের

অর্জ্জনীর রেখাগুলি দেখা যাইতেছিল। যিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহার করস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খামখানা অতি ঘনীভূত দিব্য সৌরভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যে খামটি সুগন্ধি নির্যাসে পরিপূর্ণ। ধরিবার স্থানটি যেন সুগন্ধি আতরের সংস্পর্শে ভিজিয়া গিয়াছিল, অথচ সম্পূর্ণ খামটি পূর্ব্বে যেমন বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ঠিক তেমনই বন্ধ অবস্থায়ই ছিল। ঐ ঘটনার পরে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ খামটিকে আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং অনেককে দেখাইয়াছিলাম। অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য করের স্পর্শ যে এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে তাহা মানুষ কল্পনা করিয়াও ধারণা করিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে 'যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ' গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে কোন্ কোন্ অংশে ভ্রম আছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

নিকট হইতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করে। এইরূপ নিঃসহায় ও দুরবস্থায় পড়ায় আমার জননী ও ভগিনী ভবানীপুর আশ্রমে যাইয়া বাবার চরণে কাঁদিয়া পড়েন এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত মিনতি করেন। সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই বাবা তাহাদের তাঁহার নিকট আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। ইহাতে তাঁহারা আরও বিহ্বল হইয়া পড়েন। কৃপাসিন্ধু বাবা চিরদিনই আর্ত্তগণের পরম সখা ছিলেন। তিনি উহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই তাহারা সমস্ত খাতা ফিরিয়া পাইবে বটে, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে এবং বাকী পাওনা অর্থের অধিকাংশ অর্থ আদায় হইবে। এই ঘটনার তিন চারি দিন পরেই হঠাৎ তাহাদের দোকানে পোষ্ট-ডাক যোগে সমস্ত খাতাগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহার মধ্যে প্রেরকের একখানি পত্রও ছিল। প্রেরক লিখিয়াছিলেন কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহাদের গ্রামের পুষ্করিণীতে স্নান করিবার সময় ঐ খাতাগুলি জলে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কাহারও ব্যবসায় সংক্রান্ত খাতা মনে করিয়া তিনি উহা জল হইতে উঠাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দোকানের ঠিকানা ও মালিকের নাম দেখিয়া যথাস্থানে পাঠাইলেন। প্রেরকের নাম পত্র মধ্যে অবশ্য ছিল, কিন্তু কোনও ঠিকানা না থাকার দরুণ সেই মহানুভব ভদ্রলোকটির সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ঐ হিসাবের খাতায় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আদায় বাকী ছিল। বাবার কৃপায় কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত অর্থই পাওয়া

গিয়াছিল। আমার ভগিনী অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত অশ্রুসিক্ত নয়নে বাবার চরণে সমস্ত বিষয় নিবেদন করাতে, বাবা কেবল মৃদুহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"সবই মহামায়ার লীলা!" বাবার নিকট হইতে আমার ভগিনীর দীক্ষালাভের সৌভাগ্য না হইলেও তিনি তাঁহার অত্যন্ত করুণার পাত্রী ছিলেন।

এই অকিঞ্চনের জীবনে বাবার কৃপাদৃষ্টি কতখানি গভীর ভাবে পতিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জীবনের পরতে পরতে উহা অনুভব করিতাম এবং যদিও তিনি আজ লৌকিকভাবে আমাদের অগোচর রহিয়াছেন, তাঁহার দিব্য-স্পর্শ এখনও আমরা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতেছি! সম্যক্‌ভাবে আমরা এখনও নিজকে ধরা দিতে পারি নাই, সেইজন্যই আমাদের এখনও এত সংশয়, এত শঙ্কা। বাবার কৃপায় কাশীতে আমি একখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাই। এই কার্য্যে বাড়ীর সকলেরই অমত ছিল, কিন্তু বাবা বহুবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভবিষ্যতের পক্ষে তোমার খুবই ভাল হলো।" পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এইরূপ উক্তির কারণ বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন উহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে এই কুটীর গুরুদেবের চরণ-ধূলায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই গৃহ সম্বন্ধে এইরূপ বহু ঘটনা হইয়াছিল, যাহার জন্য আমি সময় সময় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক অলৌকিক শক্তি (বাবার কৃপা ভিন্ন কি?) আমাকে এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই গৃহের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীর নির্ম্মাণ হইয়া

যাইবার পর স্থানীয় মিউনিসিপালিটি হইতে সংবাদ আসিল যে আমি রাজপথের খানিকটা অংশ অন্যায়ভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছি, সেইজন্য ঐ অংশটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাদের এই অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কোনও বিশেষ কারণে তাহাদের কোনও সভ্যের বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়াই আমার উপর ঐরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রায় এক বৎসর তাহাদের সহিত মামলার পর বাবা এই গৃহে যখন পদার্পণ করিলেন, তখন প্রাচীরের অসম্পূর্ণ অবস্থা দেখিয়া তিনি স্বয়ংই আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং মিউনিসিপালিটির কর্ম্মকর্ত্তার নিকট পুনরায় আবেদন করিতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার পর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাহারা স্বীকার করিয়া লয়। এই গৃহের সংলগ্ন একটি স্থানে কূপ খনন করিবার সময়ও আমার উপর নানারূপ বাধা ও বিপত্তি আসিয়া পড়ে। জমীদার পাঁচশত টাকা নজরানা আমার নিকট দাবী করিয়াছিল, কিন্তু বাবার নিকট এই বিষয়ে নিবেদন করিলে মাত্র পনের টাকা খরচ করিয়া সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

গুরুদেবের স্নেহ ও করুণা ছিল অসীম! আর্ত্ত ভক্তের করুণ ক্রন্দন দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, নিজের দেহের রক্ত পর্য্যন্ত মোক্ষণ করিয়া তাহার পাপ-ভোগ নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইতেন। শিষ্যগণের মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। আমার একজন ভ্রাতুষ্পুত্রী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছিল এবং প্রায় এক বৎসর

কাল বাবার নিকট হইতে জ্ঞানগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ সুবর্ণ-বসন্ত-মালতী নামক ঔষধ লইয়া ব্যবহার করিতেছিল। অনেক সময় এই ঔষধ বাবার নিকট হইতে পাওয়া যাইত না, এইরূপ অবস্থাতে সে বিনা ঔষধেই থাকিত। বাবার উপর নির্ভরশীলতা ছিল তাহার অগাধ। একদিন দুপুর বেলায় ঐ মেয়েটি জাগ্রৎ অবস্থায় দোতলার ঘরের মধ্যে শুইয়াছিল এবং আমরা ঐ সময়ে সকলে উপরে আহার করিতেছিলাম। হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করিয়া আমাদের নীচে ডাকিয়া আনিল। সে কহিল যে তাহার ঠিক বিছানার উপর কি যেন একটা পাতার মত ছোট জিনিষ ভন্ ভন্ শব্দ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল এবং দুই এক মিনিটের মধ্যে ঠিক তাহার মাথার বালিশের পার্শ্বে আসিয়া পড়িল. সে তখনই হাতে লইয়া দেখিল যে উহা একটি শ্বেত-চন্দন-লিপ্ত বিল্ব-পত্র! ঘরের চারিদিকে জাল দিয়া ঘেরা ছিল, বাহির হইতে কোন রূপ পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা ঐ জিনিষটি প্রত্যক্ষ করিলাম ও উহা একটি পাত্রে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। সেই দিন বিকালে বাবার নিকট ঐ বিষয়ে নিবেদন করাতে, তিনি কহিলেন—"উহা যেন একটি স্বর্ণ-কবচের মধ্যে রাখিয়া শরীরে ধারণ করা হয়। আয়ুষ্কাল আরও কিছুদিন বাড়াইয়া দেওয়া হইল।" এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে মেয়েটির দেহাবসান হয়। এই মেয়েটির ঘর প্রায়ই বাবার দিব্য-গন্ধে পূর্ণ হইয়া যাইত।

ঐ দিব্য-পুরুষ আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের বহির্মুখী ধারাগুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া সেই অনন্ত উৎসের সহিত যুক্ত

করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ইহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। এক পরম সার্থকতার দিকে আমরা নিয়তই ভাসিয়া চলিয়াছি। বদ্ধ অজ্ঞানী আমরা, তাঁহাকে বাহ্যভাবে চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি ; চিৎশক্তির বিলাসরূপে তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম না হইলে, তাঁহাকে পাওয়ার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। শ্রীশ্রীবাবার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ছিল অতি ব্যাপক ও তাঁহার যোগদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর। বহুবার বহুস্থানে এই সকল অপূর্ব্ব লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য এই অকিঞ্চনেরও হইয়াছে। দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস দেবের নিকট ঐ সকল যোগ-বিভূতি অতি "তুচ্ছ খেলার" মতই মনে হইত। উহা দর্শন করিয়া যাহাতে আমরা অভিভূত হইয়া আসল সত্তাটিকে ভুলিয়া না থাকি, সেইজন্য সর্ব্বদাই তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন। কায়ার সহিত ছায়ার যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত তাহার দাহিকাশক্তির যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত যাঁহার সত্যকার একাত্মতালাভ হইয়াছে, যোগ-বিভূতির সহিত তাঁহার ঠিক সেই সম্বন্ধ!

১৩৪৪ সাল, ২৭ আষাঢ়ের অপরাহ্ন-কাল, পাঁচটা বার মিনিট, আমাদের জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। তাঁহাকে সূক্ষ্মের মধ্যে আরও নিবিড়ভাবে যাহাতে শীঘ্র ধরিতে পারি, বোধ হয় সেইজন্যই তাঁহার তিরোধান ত্বরান্বিত হইয়াছিল। ২০শে আষাঢ়ের দিনটি ছিল স্থূলের মধ্যে বাবাকে আমার পাওয়ার শেষ দিন। শারীরিক ক্লিষ্টতার মধ্যেও তাঁহার দিব্য প্রশান্ত মূর্ত্তি সেই দিন আমাকে যেন বিশেষভাবে মুগ্ধ

করিয়াছিল। শ্রীচরণে প্রণতি নিবেদন করিয়া বিদায় লইবার সময় (ইহার পরদিনই আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়) অতি সস্নেহে, কোমল ও মৃদুস্বরে, তাঁহার অন্তিম বাণী আমাকে শুনাইলেন—"কত সেবাই আমার করেছ তোমরা। যদি চরিত্রবান্ হও, ধর্ম্মপথে থাক, আর আমার আদেশ মত তোমরা কর্ম্ম কর, জীবনে সুখ ও শান্তি পাবে-পাবে-পাবে। নিশ্চয়ই জেনো।" কি জানি কেন, সেই দিন সকাল হইতেই এক তীব্র বিরহ-বেদনা সমস্ত শরীর ও মনকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। হয়ত' শেষ দর্শন বলিয়াই আমার মন ঐরূপ বিচলিত হইয়াছিল। প্রণামান্তে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছিলাম ও অশ্রু-ধারায় আমার সমস্ত বক্ষঃস্থল ভরিয়া উঠিতেছিল। তিনিও মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া আমার দিকে সস্নেহে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আশ্রমের সন্ধ্যার বাতি জ্বলিয়া উঠিল, ব্যথিত হৃদয় আরও বিরহ-কাতর হইয়া পড়িল, সমস্ত দেহ নিশ্চল হইয়া আসিতেছিল—কিন্তু বিদায় ত' লইতেই হইবে! দূর হইতে পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক আমার শেষ প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম—

"হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চল সখা,
আমি যে পথ চিনি না—।"

জ্ঞানগঞ্জ

(২)

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"বিশুদ্ধবাণী"-র দ্বিতীয় সংখ্যায় জ্ঞানগঞ্জের স্থূল অবস্থানাদি বিষয়ে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি। স্থানটি বা আশ্রমটি যে অতি রহস্যমণ্ডিত তাহারও আভাস ঐ প্রবন্ধে কিছু দেওয়া হইয়াছে। ঐ রহস্য যে কত গভীর, কত গূঢ়, অথচ কত কল্যাণময় সে বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের মুখে যতটুকু তথ্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই এই আলোচনার ভিত্তি। ঐ স্বল্প পরিসর ভিত্তির উপরে যে সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে, অনুমানই তাহার উপাদান, নিছক কল্পনা নহে। কাজেই উহাকে একটা গন্ধর্ব্ব-নগরের অংশ বিশেষ বা হাওয়ার পুরী মনে করিবার হেতু নাই।

জ্ঞানগঞ্জের রহস্যকে গভীর এবং মহিমমণ্ডিত করিয়াছেন তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরমহংসগণ এবং ভৈরবী মাতারা। পরমহংসদিগের মধ্যে শ্রীশ্রীভৃগুরাম, নীমানন্দ, শ্যামানন্দ, জ্ঞানানন্দ, অভয়ানন্দ, উমানন্দ, ধবলানন্দ, এবং পরমানন্দ (গোস্বামী) আমাদের জ্ঞাত। রামানন্দ—এই নামটিও জ্ঞানগঞ্জের একটি পত্রে পাওয়া গিয়াছে, ইনি পরমহংস কিনা সে বিষয়ে

কোনও উল্লেখ নাই। ভবদেব গোস্বামীও একজন আছেন, তিনি জ্ঞানগঞ্জে থাকেন না। ভৈরবী মাতাদের মধ্যে শ্রীশ্রীউমা ভৈরবী, শ্যামা ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী, জ্ঞান ভৈরবী, আনন্দ ভৈরবী, এই কয়টি নাম জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও যে বহু পরমহংস ও ভৈরবী মাতা জ্ঞানগঞ্জে আছেন তাহাও শ্রীশ্রীবাবার মুখে শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার কার্য্যের সহিত সকলে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বলিয়াই বোধ করি অন্যদের নাম আমরা শুনিতে পাই নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত পরমহংসগণের মধ্যে উমানন্দ হইতেছেন ভৃগুরামের শিষ্য এবং ধবলানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য; পরমানন্দ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আর সকলে মহর্ষি মহাতপার শিষ্য। ভৈরবী মাতারা কে কাহার শিষ্যা তাহা জানি না। আত্মিক উন্নতিতে ইঁহারা পরমহংস দশায় প্রতিষ্ঠিত। পরমহংসদিগের এবং ভৈরবী মাতাদিগেরও অনেকেরই বয়স চারি পাঁচ শত বৎসর, কাহারও কাহারও তদপেক্ষাও অনেক অধিক জানা গিয়াছে।

মানুষের রক্ত-মাংসের দেহের বয়ঃক্রম কদাচিৎ শত বৎসরের ঊর্দ্ধে উঠিতে দেখা যায়, এবং শত বৎসরের অনেক নিম্ন বয়সেই সে দেহ নিতান্ত জীর্ণ হইয়া যায়। উক্ত পরমহংসগণ এবং ভৈরবী মাতারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম। যোগ-ক্রিয়ার ফলে তাঁহাদের দেহের রক্তমাংস প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, উপাদানেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলা যায়। তাঁহাদের ভোজনের প্রয়োজন হয় না, পুরীষাদি উৎসর্গ-ও নাই, অথচ শরীরে অমিত শক্তি, সিদ্ধি-ঋদ্ধি অতুলনীয়, জ্ঞান অপ্রতিহত। তাঁহাদের গতি

অবাধ, তাঁহারা অক্লেশে গৃহের প্রাচীর ত তুচ্ছ কথা, পর্ব্বত শিলোচ্চয়ও নিমেষ মধ্যে ভেদ করিয়া যান। অতি দূর বা অতি নিকট বলিয়া কোনও বস্তু দেখিতে তাঁহাদের বাধা হয় না। দেশ ও কাল তাঁহাদের গতি, চিন্তা, বা জ্ঞানের নিয়ামক নয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাঁহাদের এই অতিমানব জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য কি? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে তাঁহারা ত মোক্ষই বরণ করিতে পারিতেন। সাধারণে যাহাকে মোক্ষ বলে, নির্ব্বাণ বলে, তাঁহাদের অবস্থা তাহা হইতে উচ্চই বলিতে হইবে। তাহা মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লঙ্ঘন করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন? কিসের আশায় বা কিরূপ কর্ত্তব্য বোধ হইতে?

বাবার মুখে শুনা গিয়াছে, পরমহংসদিগের অনেকে অনুক্ষণ বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকেন। যোগীরাও যোগ অবশ্যই করেন। উভয়েরই ফল হইতেছে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং শক্তির প্রসার। জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই অনন্ত। উভয়ই অনন্তভাবে ঈশ্বরে বর্ত্তমান। জ্ঞান স্থির, শক্তি চঞ্চলা। এইজন্য পূর্ণ ঈশ্বরকে শিব ও শক্তিরূপে পৃথক্ কল্পনা করা হয়। একদিক্ দিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অন্যদিক্ দিয়া সর্ব্বশক্তি। দুইদিকেই পূর্ণ—ইহাই ঈশ্বরত্ব। সম্পূর্ণ ঈশ্বরত্ব জীবের লভ্য নহে। যোগী ঈশ্বর বটেন, কিন্তু পূর্ণতম ঈশ্বর নহেন। বাবা বলিতেন জীব কখনও ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা দ্বারা যোগী জীব ক্রমশঃ অনন্তের সন্নিহিত হয়েন এবং তাঁহার সহিত ঘন, ঘনতর ঐক্য বা সাযুজ্য লাভ করেন। ইহা তাঁহার

সত্তার উত্তরোত্তর বিকাশ। বুদ্ধত্ব সম্বন্ধেও একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন—"Buddhism is a process of becoming and admits of no conceivable end"—বাবাও বলিতেন যোগীর কর্ম্মের অন্ত নাই।

যোগীরা ঈশ্বর। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসেরাও ঈশ্বর—পরমেশ্বর আখ্যার যোগ্য হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও উচ্চাবচ ভাব আছে। বাবা বলিতেন, ভৃগুরাম পরমহংস বয়সে অনেকের চেয়ে কনীয়ান্ হইলেও যোগৈশ্বর্য্যে জ্যায়ান্। ইঁহারা সকলেই আরও উচ্চতর, পূর্ণতর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পথের পথিক বলিলে বোধ করি ভুল হয় না। কেহ চলিয়াছেন বিজ্ঞানের পথে, কেহ যোগের পথে, কেহ বা উভয় পথে। অথবা হয়ত যোগ ও বিজ্ঞান একই পথ। এই দীর্ঘ দুর্গম পথে চলার উৎসাহ জোগায় মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের লীলা দেখার আনন্দ।

কিন্তু ইঁহারা কি আত্মার্থেই এই সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া আছেন? ঈশ্বর ও আত্মার্থে পূর্ণ নহেন। যোগসূত্র ভাষ্যে বলা হইয়াছে—"তস্য স্বাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।" তাঁহার নিজের কোনও উপকার সাধনের প্রয়োজন নাই, পরকে অনুগ্রহ করার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই সম্মিলিত শিব-শক্তি (বা সদাশিব তত্ত্ব) হইতে ঈশ্বরের আবির্ভাব ও পৃথক্ (যদিও অবশ্য পূর্ণ) অস্তিত্ব বরণ। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণ এবং ভৈরবী মাতারা—যাঁহারা পূর্ণ ঈশ্বরত্বের সন্নিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা কি তাঁহার মহাকরুণ চিত্তের অংশ আয়ত্ত করেন নাই এবং তাঁহার মত তাঁহাদেরও "ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্" নয়?

কিন্তু অনুগ্রহটা কি প্রকারের? স্ত্রী, অন্ন, পান ইত্যাদি শ্রেয়ঃ উপচার সরবরাহ কি? প্রতি জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মই তাহা করে—ঈশ্বরও কর্ম্মফলদাতৃরূপে তাহার ব্যবস্থা করেন। সেটা অনুগ্রহ নয়। শ্রেয়ের পথে মানুষের স্বারসিক প্রবৃত্তি হয় না (কোটিতে দুই-একজন ব্যতীত)। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অল্প লোককেই সে-পথে ঠেলিয়া দেয় এবং তথায় রক্ষক ও পরিচালক না মিলিলে ক্রিয়মাণ নূতন নূতন কর্ম্ম আসিয়া সে-পথ হইতে জীবকে চ্যুতও করে। সেইজন্য সৎ-পথে লোককে প্রবৃত্তি দিবার জন্য এবং প্রবৃত্ত লোককে পরিচালিত করিবার জন্য ঈশ্বরকে ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা তিনি করেন জগদ্‌গুরু-রূপে। তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া সদ্‌গুরুগণ মানুষকে শ্রেয়ের পথে প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত করিবার চেষ্টায় থাকেন। ইহাতেও অনন্ত চেষ্টার, অনন্ত অধ্যবসায়ের, অনন্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন। স্থূল দেহধারী মনুষ্যোচিত আয়ুঃসম্পন্ন সদ্‌গুরুর পক্ষে কত বৃহৎ আয়োজনই সম্ভব? সেইজন্য তাদৃশ গুরুর প্রেরক ও ধারকরূপে জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসদিগের মত দীর্ঘায়ুঃ ও অমিতশক্তি যোগিগণের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু দৃশ্যতঃ নীচের দিক হইতে এই কৃপালীলার সূচনা করিতে হয় স্থূল দেহাশ্রয়ী মনুষ্যোচিত আয়ুঃসম্পন্ন সদ্‌গুরুকেই। তিনিই চাকা ঘুরাইয়া দেন এবং অনিদ্র ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাহার গতি শুধু অব্যাহতই রাখেন না, আবশ্যকমত তাহার বেগ বাড়াইয়াও দেন। শ্রীশ্রীবাবা দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার কুকুর দংশন, তজ্জন্য অসাধারণ

রকমের জ্বালা, আত্মহত্যার উদ্যোগ ইত্যাদি নানা খেলার অবতারণ করিয়া জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণ তাঁহাকে নিজেদের ধামে নিয়া যান এবং সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে নানা শিক্ষা দান দ্বারা নানাশক্তির আধার করিয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রেরণ করেন এবং ক্রমে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তৎপরেও তাঁহার কার্য্য নিজেদেরই কার্য্য বলিয়া আবশ্যকরূপ উপদেশ দান ও সাহায্য করিতে থাকেন।

এই ব্যাপারে আরও একটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য বিষয় আছে। জ্ঞানগঞ্জের নীমানন্দ পরমহংস বাবাকে হুগলীতে দর্শন দেন এবং পরে তিনিই ঢাকা হইতে তাঁহাকে জ্ঞানগঞ্জে নিয়া যান, অথচ তিনি বাবাকে দীক্ষা দেন নাই; তজ্জন্য তিনি বাবাকে তাঁহার স্বগুরু মহাতপার নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার দ্বারাই তাঁহাতে শক্তিপাত করান। তৎপর ভৃগুরাম পরমহংস তাঁহাকে যোগশিক্ষা এবং শ্যামানন্দ পরমহংস বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে থাকেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু পরমহংস দশায় উন্নত শিষ্য আছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত পরমহংসগণ মধ্যে উমানন্দ ভৃগুরামের এবং ধবলানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য; আরও নিশ্চয় বহু শিষ্য আছেন, অথচ ইঁহারাও বাবার দীক্ষাগুরুত্ব গ্রহণ করেন নাই। যিনি ইঁহাদেরও জ্ঞান ও শক্তির, প্রজ্ঞা ও করুণার, উৎস, তাঁহা হইতেই দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনে হয় যেন মহর্ষি মহাতপাই নীমানন্দ পরমহংসকে হুগলীতে এবং ঢাকায় পাঠাইয়া বাবাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, উমা ভৈরবী মাকে বিন্ধ্যাচলে পাঠাইয়া বাবাকে সান্ত্বনা ও সাহস দানের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন এবং পরে স্বয়ং দীক্ষা দান করিয়া ভৃগুরাম ও শ্যামানন্দ নামক নিজ নিজ বিভাগে শ্রেষ্ঠ দুই পরমহংসের হস্তে যোগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন। উমা ভৈরবী মাতাও সম্ভবতঃ মহাতপার নিয়োগার্থ বরাবর ভৃগুরাম পরমহংসের সঙ্গে বাবাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

এদিকে শ্রীশ্রীবাবাও মহাতপাঃ হইতে দীক্ষা এবং তৎসঙ্গে ভাবী উন্নতি ও কর্ত্তব্যের বীজ প্রাপ্ত হইলেও পরম স্নেহবান্ অথচ কঠোর নিয়ামক শিক্ষাগুরু ভৃগুরাম পরমহংসের প্রতি এত দূর সক্রিয় ভক্তি ও নিষ্ঠাসমন্বিত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দেখাইয়াছিলেন যে ক্রমে ভৃগুরাম তাঁহাকে নিজেরই বিলাস-বিশেষরূপে দেখিতে থাকেন, যেন একাত্মক অথচ পৃথক্। বাবাকে দীক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার সময় ভৃগুরাম বলিয়াছিলেন, দীক্ষা তুমি দিবে না, আমিই দিব, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। এইরূপে তাঁহাকে তাঁহার মহৎ পদের গুরুতর দায়িত্বে সম্যক্ সম্বুদ্ধ করিয়া কিছুদিন পরে বলেন, এখন হইতে তুমিই নিজ দায়িত্বে দীক্ষা দিতে থাক। একজন যে অন্যের প্রতিনিধি এবং তাহার সহিত একাত্মক তাহাও ভৃগুরাম একখানি পত্রে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন: "তুমি যে সকলকে বর্ত্তমান সময়ে শিষ্য করিয়াছ, আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিন যাই ও সম্যক্ দৃষ্টিরূপে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়াই। আমি সমস্ত দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না। ... তুমি আমি উপাধিধারি-মাত্র, এক ছাড়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু কি আছে ভাই? ... আমি আছি, থাকিব। জগৎ যাইবে, আমি থাকিব। তবে তুমি আমি কে

ভাই? তোমার সমস্ত শিষ্য আমি, যে হইবে সে-ও আমি, যে যাইবে সে-ও আমি। আমি তাহাদের গুরু। গুরুবাক্যটা কঠিন বাক্য। ... তোমার সমস্ত শিষ্যের বিষয়ে আমি পরীক্ষক, অন্তরাল হইতে পরীক্ষা লইব, তাহারা বুঝিতে পারিবে (না)। শিষ্য কর, ধর্ম্ম-প্রচার কর—আমার আপত্তি নাই। বিচার করিবে না। (যখন) তোমাতে আমি প্রবেশ করি তখন তুমি আমি· যখন ছাড়ি তখন তুমি তুমি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূর্ণ ঈশ্বরই গুরু, জগদ্-গুরু। মহাতপাঃ তাঁহারই প্রতিমাবিশেষ, অথবা শৈবদর্শন মতে ঈশ্বর হইতে উর্দ্ধতর তত্ত্ব সদাশিবের প্রতিনিধি বা প্রতিমা। তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিপুলভাবে ভৃগুরাম পরমহংসে এবং তদ্দ্বারা বাবা বিশুদ্ধানন্দে জগতের কল্যাণার্থ আবৃত্ত হইয়াছে। "গুরু বাক্য কঠিন বাক্য"; গুরুর কর্ত্তব্য ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্ যোগীরই সাধ্য—প্রতি শিষ্যের উপর প্রতি ক্ষণ অতন্দ্রিত দৃষ্টি। তদনুরূপ সামর্থ্যদান করিয়াই ভৃগুরাম বাবা বিশুদ্ধানন্দকে গুরুগিরি করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বুঝিতে হইবে প্রকৃত গুরুগিরি ছেলে খেলা নয়।

জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণের মধ্যে আর একজনের ব্যাপকরূপে লোকহিতৈষণা ব্রতের খবর আমরা জানি। ইনি জ্ঞানানন্দ (নামান্তর কুতুপানন্দ), থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িত্রী মাদাম ব্ল্যাভাস্কির (Blavatsky) গুরু। অন্যান্য পরমহংসগণেরও অনুরূপ কৃপাব্রত থাকা সম্ভব। অন্ততঃ সকলেই একভাবে না একভাবে জগতের কল্যাণ-সাধনে ব্যাপৃত আছেন ইহা সহজেই অনুমেয়।

ভৈরবী মাতাদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। 'বাবা বিশুদ্ধানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন, প্রতিনিধিও রাখিয়া যান নাই। অতএব ভৃগুরাম পরমহংসের জগদুদ্ধার ব্রতের এখানেই পরিসমাপ্তি হইয়াছে', এবং 'থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় এখন অনেকটা ক্ষীণোৎসাহ ও ক্ষীণপ্রভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কুতুপানন্দ পরমহংস তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন', এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসঙ্গত।

জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণের জগতের শ্রেয়ঃসাধন ব্রতের বিষয়ে যে মত উপরে বিবৃত হইল তাহার দৃষ্টান্তরূপে মহাযান বৌদ্ধ মতের বোধিসত্ত্ব আদর্শের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে পারি। সকলেই হয়ত জানেন যে বৌদ্ধ মতের দুইটি শাখা আছে, একটির নাম হীনযান বা থেরবাদ (স্থবিরবাদ), অন্যটির নাম মহাযান। হীনযান মতে প্রত্যেক সাধককে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-চেষ্টায় মোক্ষ (যাহার বৌদ্ধ সংজ্ঞা হইতেছে "নির্ব্বাণ") সাধন করিতে হইবে; স্বয়ং বুদ্ধদেব একটা পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন মাত্র, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তিনি কাহারও উদ্ধার-কর্ত্তা নহেন। বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া সাধন দ্বারা নির্ব্বাণের সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহাদিগকে বলা হয় অর্হৎ। ইহাই হীনযান মতের উচ্চতম অবস্থা। সাধনের অঙ্গরূপে অর্হৎগণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ইত্যাদি ধর্ম্ম অনুশীলন করেন বটে, কিন্তু করুণা-বশে পরোদ্ধার ব্রত কখনই তাঁহারা গ্রহণ করেন না, নিজেদের উদ্ধার সাধনই তাঁহাদের লক্ষ্য।

সে আদর্শ হইতেছেন বোধিসত্ত্ব।

এই শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ। একটি হইতেছে যিনি বহু বহু জন্মব্যাপী সাধন দ্বারা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, ও প্রজ্ঞা এই ছয়টি গুণের বা ধর্ম্মের পারমিতা অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া বুদ্ধত্বের সন্নিহিত হইয়াছেন, কিন্তু জগতের সকল জীবের দুঃখ দুর্গতি নিরীক্ষণ করিয়া অপার করুণাবশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যতদিন একটি জীবও নির্ব্বাণে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন তিনি বুদ্ধত্ব বরণ করিবেন না, সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধনে ব্যাপৃত থাকিবেন। দ্বিতীয় অর্থটি অনেকটা তাত্ত্বিক (metaphysical) রকমের। মহাযান মতের উচ্চতম তত্ত্ব হইতেছেন ধ্যানী বুদ্ধ; ইনি মানুষ বুদ্ধ নহেন। বোধিসত্ত্ব সেই ধ্যানী বুদ্ধেরই অবতার, জগতের পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্রেয়ঃ-সাধনার্থ তৎকর্ত্তৃক বুদ্ধত্বের কিঞ্চিৎ নিম্ন অবস্থায় প্রতিষ্ঠাপিত। কার্য্যতঃ দুই অর্থেরই সমন্বয় করিয়া বোধিসত্ত্বাদর্শের ধারণা ও বিচার করা হয়—একদিকে নীচ হইতে ঊর্দ্ধে উত্তরণ (matter ascending to spirit), অন্যদিকে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ (spirit descending into matter)।*

অবশ্য বৌদ্ধমতে এবং হিন্দুমতে প্রভেদ বিস্তর। এখানে একটা সমান্তরাল সূত্রতা (parallelism) মাত্র দেখান যাইতে পারে। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণ প্রত্যেকে সাধনদ্বারা উন্নত হইয়া নিজেদের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জগদুদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এই দৃষ্টিতে তাঁহারা বোধিসত্ত্বের সহিত তুলনীয়। ইহা নীচ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থানের দিক্। আবার

* Christmas Humphrey প্রণীত Buddhism গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মহাতপাঃ মহাশয়কে ধ্যানী-বুদ্ধ স্থানীয় মনে করিলে তাঁহার প্রভাব বোধিসত্ত্ব স্থানীয় ভৃগুরামাদি পরমহংস মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা মনে করা যায়—এটা উর্দ্ধ হইতে নীচে অবতরণের অর্থাৎ অবতারের দিক্।

জ্ঞানগঞ্জ তিব্বতের একাংশে অবস্থিত থাকার কারণ বলা যাইতে পারে ঐ স্থানটি বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত "সভ্যতা" দ্বারা দূষিত হয় নাই। যথা—"For thousands of years these spiritual leaders and guardians of man-kind (অর্থাৎ তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ মতে বোধিসত্ত্ব-দশা প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ), known by a score of names in various religions, have made their home in a region as yet unsoiled with 'civilization,' from which they work on the inner planes of consciousness. Not all, of course, are Buddhists, but whatever the body and religion of the adept concerned, the task of the Brothers is the same to guide and influence the more enlightened leaders of mankind into the paths of spiritual advancement for all."* এই উক্তিটির মূল্য আমাদের সমগ্র বিচার্য্য বিষয়ে অল্প নহে।

আরও একটা অনুরূপ ভাবের কথা মনে আসিতেছে। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি। বাবা

* পার্ব্বাক্ত পস্তক।

বলিতেন, আমাদিগকে আর স্থূল জগতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের জ্যেঠা গুরুদেব (ভৃগুরাম পরমহংস) এক ধাম সৃষ্টি করিয়াছেন ; এখানে মৃত্যুর পরে আমরা সেইখানে গিয়া কর্ম্ম সমাপন করিব। এই ভাবটাও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক শাখায় পাই। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হইয়াছে Pure Land School. খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতেই নাকি এই মত ভারতে উৎপন্ন হয়। ইহা "সুখাবতীব্যূহ সূত্র" (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) নামে দুইখানি গ্রন্থ এবং "অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র" নামে আর একখানি গ্রন্থের সঙ্গে চীনদেশে এবং তথা হইতে জাপানে যায়। তত্রত্য শীন (Shin) বৌদ্ধ-মতের ইহাই মূল। নালন্দায় নাকি "সুখাবতীব্যূহ সূত্রদ্বয়" বিশেষভাবে পঠিত হইত। ইহাতে পাওয়া যায়—বোধিসত্ত্ব অমিতাভ সুখাবতী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে ভক্তিমান্ বৌদ্ধগণ মৃত্যুর পরে গিয়া তাহাদের সকল সাধনের ফলস্বরূপ নানা সুখ ভোগ করেন ও করিবেন। সুখগুলি কিছু স্থূল রকমের, অনেকটা মুসলমানদিগের স্বর্গ-সুখের অনুরূপ। কিন্তু ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐস্থানে যাইতে হইলে কঠোর সাধনের এবং মৈত্রী ও করুণা (নিজ পুণ্য-দান দ্বারা অপরকে সাহায্য) প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুশীলনের প্রয়োজন। আর যেহেতু বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সকলকে নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রস্তুত করা, সুতরাং ইহাও মনে করা অন্যায় নহে যে সুখাবতীতে বসিয়া কেবল স্থূল রকমের সুখই ভোগ করিতে হইবে না, নির্ব্বাণ লাভের জন্য যেরূপ সাধনের প্রয়োজন তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মোট কথা, সাধন বিনা সিদ্ধি নাই।

হীনযান মতে বুদ্ধ পথ দেখাইয়াছেন মাত্র, সাধককে নিজের চেষ্টায় চলিতে হইবে। মহাযান মতে বোধিসত্ত্ব আরও একটু কাছে আসিয়া এবং নিজের অনন্ত পুণ্যেরও অংশ ভাগ করিয়া দিয়া একটু অধিক সাহায্য করেন। কেননা তিনি ধ্যানী বুদ্ধের কৃপাবতার। আমাদের বোধিসত্ত্ব ভৃগুরাম স্বামী আমাদের জন্য যে ধাম প্রস্তুত করিয়াছেন তথায় স্থূল রকমের সুখভোগের কোনও প্রলোভন নাই, সেটি সুখাবতী পুরী নয়, জাগতিক দুঃখমুক্ত কর্ম্মধাম।

শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী মহাসন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, সাধকবর্গের নিকট পঞ্চমুণ্ডী আসনের নাম সুপরিচিত। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, রাজা রামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই পঞ্চমুণ্ডী আসনে উপবেশন করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখনও বঙ্গদেশের বহুস্থানে, এমন কি বঙ্গদেশের বাহিরেও কোন কোন বিশিষ্ট তীর্থস্থানে, কোন কোন সিদ্ধ-সাধকের পঞ্চমুণ্ডী আসন বিদ্যমান আছে।

পঞ্চমুণ্ডী আসনের প্রসঙ্গ তন্ত্র শাস্ত্রে অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ ত্রিমুণ্ডী ও একমুণ্ডী আসনের কথাও তন্ত্র শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে আছে। পঞ্চমুণ্ডী আসনে কোন্ কোন্ পাঁচটি সামগ্রী পঞ্চমুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ তাহারও বৃত্তান্ত সাধক সমাজে অপরিচিত নহে।

কিন্তু পঞ্চমুণ্ডী আসন বাস্তবিক পক্ষে কি তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সাধারণ সাধকের পক্ষে আসনের বিচার আবশ্যক হইলেও তত আবশ্যক নহে, কিন্তু যোগীর পক্ষে আসন-তত্ত্ব একটি অতি গভীর সমস্যা। কারণ ইহার সমাধানের উপরেই সাধকের সিদ্ধির উৎকর্ষগত মাত্রা নির্ভর করে। তবে

এ কথা সত্য যে আসন-রহস্য অবগত না হইলেও অনেকেই পঞ্চমুণ্ডী আসনের মাহাত্ম্যের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু মনে হয় নবমুণ্ডী আসনের নাম পর্য্যন্ত আজও কেহ অন্য কোথাও শুনে নাই। পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ৺কাশীধামে 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' নামক নিজের আশ্রমে শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী আসনের প্রতিষ্ঠার পর অল্পাধিক পরিমাণে এই আসনের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, ইহার মাহাত্ম্য কি, এবং পঞ্চমুণ্ডী আসনের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, এই জটিল বিষয় এখনও প্রায় দুর্ব্বোধ্যই রহিয়াছে। যাঁহারা বহিরঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে এই তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে ইহা সত্য, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যেও অনেকে এই তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানি না।

গত ১৩৪১ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে এই আসনের স্থাপনা হইয়াছিল। আসন-স্থাপনার পর আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুদেব একদিন বলিয়াছিলেন, "চল্লিশ বৎসরের অধিক কালব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর আজ এই মহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলাম। ৺কাশীধাম জ্ঞানক্ষেত্র, তাই এই ক্ষেত্রেই মহাবিজ্ঞানের কেন্দ্র স্বরূপ এই মহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজ্ঞান-মন্দির রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কার্য্যকারিণী শক্তির মূল উৎস এই মহাসন। ইহার শক্তি অপরিসীম—যোজনে যোজনে ইহা প্রসারিত হইয়া যথাসময়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিবে। বিজ্ঞানের অর্থাৎ সূর্য্য-বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিজ্ঞানের সফলতা সম্বন্ধে আর —— থাকিল না।" নবমণ্ডী আসন পরম পবিত্র ও

অত্যন্ত মহনীয়। ইহার তত্ত্ব এতই গুহ্য যে সাধারণতঃ ইহার সম্বন্ধে বাবাজী কাহাকেও বিশেষ কিছু বলিতেন না। লৌকিক কামনা-সিদ্ধির অনুকূল অসাধারণ সামর্থ্য ইহার আছে, ইহা তিনি বলিতেন, কিন্তু লোকোত্তর পরমসিদ্ধির মূলে ইহাই যে একমাত্র মহাশক্তিরূপে কার্য্য করে এবং করিবে তাহা তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করিতেন না। কারণ ইহা সকলের বুঝিবার বিষয় নহে এবং সকলের পক্ষে ইহা জানাও আবশ্যক নহে।

(২)

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে নবমুণ্ডী আসনের তাৎপর্য্য কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীগুরু-কৃপায় আমি নিজে যতটুকু উপলব্ধি কবিয়াছি শাস্ত্রীয় পরিভাষা অবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব সরলভাবে তাহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যদি কোন অংশে ভ্রম বা ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা আমার নিজের ধারণার ও প্রকাশের সামর্থ্যের ন্যূনতা হইতে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। সরলভাবে আলোচনা করিলেও হয়তো ইহা অনেকের বোধগম্য হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আলোচনা হইতে বিরত থাকা অনুচিত মনে করিয়া আজ এই দুরূহ বিশ্লেষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। পঞ্চমুণ্ডী আসনের সঙ্গে নবমুণ্ডী আসনের কি সম্বন্ধ তাহা এই আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

'আসন' ও 'আসীন' এই দুইটি শব্দ আমরা সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া থাকি। আসনে আসীন হইয়া অর্থাৎ উপবিষ্ট

হইয়া যোগ-সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সাধারণতঃ আসন বলিতে বাহিরের কোন আস্তরণ বুঝায়। কুশাসন, কম্বল, গালিচা, অজিন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সিংহচর্ম্ম প্রভৃতি বহু প্রকার বাহ্য আসন সাধক-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। আসনে বসিলে যোগাঙ্গ আসন সহজে সম্পাদন করিতে পারা যায় এবং উহার ফলে প্রাণায়াম ও চিত্তের একাগ্রতা-সাধন সহজ হয়, এইজন্য আসনের ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রকৃতি অনুসারে যাঁহার পক্ষে যে আসন উপযোগী গুরু এবং শাস্ত্র তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রচলিত তান্ত্রিক সাহিত্যে এবং যোগ-সাধনের গ্রন্থে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি বহু বাহ্য আসনের বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা রহিয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসনের উপযোগিতার দিক্ হইতে তন্ত্র-শাস্ত্রে শবাসনেরও ব্যবস্থা আছে। তান্ত্রিক সাধনাতে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে আসনের উপযোগী শবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মিক তেজের বিকাশের পক্ষে বহিরঙ্গ কুশ-কম্বলাদি আসন হইতে শবাসন অধিক উপযোগী। কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে, কোন কোন বিশিষ্ট সাধনার জন্যই তাহা আবশ্যক হয়।

প্রকৃত শবাসন বলিতে বুঝায় শবীকৃত নিজ দেহ, অর্থাৎ নিজের দেহকে শবরূপে পরিণত করিয়া দেহস্থ চৈতন্য তাহার উপর অধিষ্ঠান করিলে ঐ শবরূপী দেহ হয় 'আসন' ও উহার অধিষ্ঠাতা চৈতন্য হয় 'আসীন'। এই আসন ও আসীনের যোগ যোগ-সাধনাতে নিত্য-সিদ্ধ, তবে সাধনার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভূমি ক্রমশঃ অধঃ হইতে ঊর্দ্ধের দিকে উত্থিত হয়।

(৩)

আগমের পরিভাষাতে সমগ্র বিশ্ব ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। এই ছত্রিশটি তত্ত্বকে ভেদ করিয়া ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে বিশ্বকে অতিক্রম করা যায় না। বিশ্বের মধ্যে একাংশে অধঃ ঊর্দ্ধ অনেকগুলি স্তর আছে। এই স্তরগুলি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন অণ্ডরূপে যোগি-সমাজে পরিচিত। এক একটি অণ্ডে একাধিক ভুবন অবস্থিত রহিয়াছে এবং অন্তর্বর্ত্তী ঐ সকল ভুবন কোন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব অথবা তত্ত্বসমষ্টির দ্বারা রচিত। আমরা যে জগতের সহিত পরিচিত তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ইহার অন্তর্গত যাবতীয় ভুবন প্রধানতঃ পৃথিবী-তত্ত্বের দ্বারা রচিত। পৌরাণিকগণ ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে অবান্তর ভুবন যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাদের মধ্যে নরক অথবা নিরয়স্থান ও পাতাল, এই দুইটি অধোরাজ্যের অন্তর্গত। নরকের বহু প্রকার ভেদ আছে, পাতালেরও বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ই অধোলোকের অন্তর্গত। প্রত্যেকটি লোক বা ভুবনের নির্দ্দিষ্ট অধিষ্ঠাতা আছেন। নরকের মধ্যে অবীচি নামক স্থানটি ঘোর তমসাচ্ছন্ন—সেখানে আলোকের কিরণ-রেখা পর্য্যন্ত কখনও প্রবিষ্ট হয় না। পাতালসমূহ অধোলোক হইলেও সেখানে একটা ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—উহা মণিমুক্তার প্রকাশ এবং কিয়দংশে অগ্নিজ্যোতির প্রকাশ জানিতে হইবে। পাতালের উপরে ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-পৃষ্ঠের উপর অন্তরিক্ষ এবং অন্তরিক্ষের উপর স্বর্গ। স্বর্গ এক

নহে, বহু। এই সকল স্বর্গের মধ্যে নিম্নতম স্তরে দেবরাজ ইন্দ্র শাসনকর্ত্তার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঊর্দ্ধতন স্বর্গগুলি তদ্রূপ কোন শাসনকর্ত্তার অধীন নহে। এইগুলি এক হিসাবে ভোগ-লোক হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের ফলভোগের স্থান। তাই ইহারা অন্যদৃষ্টিতে মুক্তিক্ষেত্ররূপেও পরিগণিত হইয়া থাকে। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই কয়েকটি লোক ঊর্দ্ধতম স্বর্গ বা দ্যুলোক নামে পরিচিত। ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতা ত্রিদেব ঈশ্বর ঊর্দ্ধস্থিত সত্যলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। অবীচির নিম্নপ্রদেশ হইতে সত্যলোকের ঊর্দ্ধতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একটি অণ্ডের অন্তর্গত। ইহার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, তাই এই অণ্ডটিকে ব্রহ্মাণ্ড নামে নির্দ্দেশ করা হয়। বহির্জগতে যেমন ব্রহ্মাণ্ড আছে সেই প্রকার মনুষ্যের দেহরূপ অন্তর্জগতেও ব্রহ্মাণ্ড আছে, অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের স্তর-সন্নিবেশ একই প্রকার।

যে যোগী নিজের দেহকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে ধারণা করিতে পারে—ইহার নাম বৈরাজ ধারণা—এবং এই ধারণার ফলে নিজেকে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা বলিয়া চিনিতে পারে সে তখন ব্রহ্মার সমকক্ষ হয়। ব্রহ্মা যেমন ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের অভিমানী, পিণ্ডাবচ্ছিন্ন আত্মাও তখন তাহাই। এই অবস্থায় যোগীর পদ ব্রহ্মা অথবা হিরণ্যগর্ভ পদের সহিত সাম্যযুক্ত হয়। এই যোগীকে ব্রহ্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু যে যোগী নিজের চৈতন্য-সত্তাকে ব্রহ্মাণ্ডের তাদাত্ম্য-

করিতে সমর্থ হয় অথচ ব্রহ্মাণ্ডকে ত্যাগ করে না কিন্তু নিজের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে, সে অসাধারণ ও উৎকৃষ্ট যোগী। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তখন শবরূপে পরিণত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর যে যোগী অধিষ্ঠান করে সে ব্রহ্মারও অতীত। সে ব্রহ্মাণ্ড-রূপী নিজ কায়কে শবরূপে পরিণত করিয়া তাহার উপর নিজে আসীন হইয়া ধ্যানে মগ্ন হয় ব্রহ্মা তখন প্রেত, ব্রহ্মার কায় তখন আসন। বস্তুতঃ এই আসনের নামই একমুণ্ডী আসন। ব্রহ্মাণ্ড এক নহে, অনন্ত অক্ষৌহিণী ব্রহ্মাণ্ড মহাশূন্যের মধ্যে দুলিতেছে। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই প্রধানতঃ পৃথিবী-তত্ত্বের দ্বারা বিরচিত। সুতরাং একমুণ্ডী আসনের যোগী পৃথ্বীতত্ত্বকে জয় করিয়া তাহার নিয়ামক হইয়া থাকে, ইহাই তাহার ঐশ্বর্য্য। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাহার আয়ত্ত হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে তাহার গতি নাই। এই যোগী ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়াছে বটে, কিন্তু পৃথ্বীতত্ত্বের উপর তাহার উঠিবার সামর্থ্য নাই—পৃথ্বীতত্ত্বের উপরে কোন তত্ত্বই তাহার আয়ত্ত হয় নাই। এইজন্য তাহার বিরাট্ ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার বহু কর্ম্ম বাকী থাকিয়া যায়। একমুণ্ডী আসনে কর্ম্ম করার অর্থই এই—জলতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তত্ত্ব সকলকে ক্রমশঃ আয়ত্ত করা।

(৪)

ব্রহ্মাণ্ড একটি স্তর মাত্র এবং ইহার সর্ব্বত্রই সামান্যতঃ পৃথ্বীতত্ত্ব বিরাজমান রহিয়াছে। তাই যোগীর নিকট 'পৃথিবী' শব্দের অর্থ সাধারণ লোকের পরিচিত পৃথিবী হইতে ভিন্ন প্রকার।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সকল ব্রহ্মাণ্ডই পৃথিবীর অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অথবা উর্দ্ধে ব্রহ্মাণ্ড হইতেও বিশাল যে অণ্ড রহিয়াছে তাহা প্রকৃত্যণ্ড। বাস্তবিক পক্ষে এই বিশাল প্রকৃতি-অণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সকল ভাসিতেছে। যোগী যোগমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মের প্রভাবে এই অণ্ডটিকেও নিজের বশে নিয়া আসে। ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় প্রকৃত্যণ্ডও বিচিত্র। এই সকল অণ্ড প্রকৃতির অন্তর্গত, এবং জলতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সম্মিলিত স্বরূপে ইহা রচিত। এই অণ্ডের অধিষ্ঠাতাকে বিষ্ণু বলে। এই বিষ্ণু সত্যলোকের অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যে যোগী নিজের দেহকে প্রকৃত্যণ্ডের সহিত অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহার ফলে নিজেকে প্রকৃত্যণ্ডের অভিমানী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন মনে করে সে পূর্ব্বোক্ত যোগী হইতে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অগ্রগতিশীল যোগীর লক্ষ্য এই স্থানে নিবদ্ধ নহে। প্রকৃত্যণ্ডে ব্যাপ্ত চৈতন্য সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া প্রকৃত্যণ্ডকে ভেদ করিতে পারিলে এই অণ্ডটিও ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় শবরূপে পরিণত হয়। তখন সেই অণ্ডভেদী চৈতন্যসম্পন্ন যোগী শবরূপ আসনে পরিণত প্রকৃত্যণ্ডের উপর অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যোগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। এই যোগীকে দ্বিমুণ্ডী-আসন সাধক যোগী বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডভেদী যোগী হইতে প্রকৃত্যণ্ডভেদী যোগীর স্থান অনেক উর্দ্ধে। চতুর্বিবংশতি তত্ত্বই এই যোগীর আয়ত্ত হয় এবং যোগীর সঙ্কল্প

(৫)

অণ্ড মধ্যে প্রকৃত্যণ্ডই শেষ নহে। প্রকৃত্যণ্ডও বস্তুতঃ এক নহে। অলাবু-লতাকে আশ্রয় করিয়া যেমন বহু সংখ্যক অলাবু ঝুলিতে থাকে তদ্রূপ মায়াকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য প্রকৃত্যণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই মায়াও অণ্ডাকারে যাবতীয় প্রকৃত্যণ্ডকে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগের মূল উপাদান, ভিত্তি এবং বেষ্টন-প্রাচীররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মায়ার বেষ্টনীটি অতি বিশাল, ইহা তমোময় অবিদ্যাঘন ও দুর্ভেদ্য। দূর হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় যেন এই মায়ারাজ্য একটি বিশাল কারাগার, ইহার বাহিরে যাইতে না পারিলে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। মায়ার প্রধান লক্ষণই ভেদজ্ঞান। সুতরাং মায়াণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য প্রকৃত্যণ্ড এবং প্রতি প্রকৃত্যণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বত্রই মায়াকৃত এই ভেদজ্ঞান নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে। ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াণ্ডের বাহিরে যাইবার অধিকার জন্মে না। পুরুষ এবং সপরিকর মায়া, এই উভয়ের সম্মিলনে সমগ্র মায়াণ্ডটি রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মায়াবচ্ছিন্ন পুরুষই মায়াণ্ডের প্রাণশক্তি। মায়া প্রধানতঃ স্বরূপ-শক্তিকে আবরণ করিয়া থাকে। শিবস্বরূপ দিব্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পাঁচটি শক্তি আছে। তাঁহার অনন্ত শক্তি এই পঞ্চশক্তিরই অনুবর্ত্তী। এই পাঁচটি শক্তিই তাঁহার স্বরূপের সহিত অভিন্ন। এই পাঁচটি শক্তির সহযোগে শিবরূপী আত্মা নিত্য, বিভু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং আপ্তকাম। কিন্তু যখন আত্মা নিজের অন্তর্নিহিত ও স্বরূপভূত স্বাতন্ত্র্য-শক্তির উন্মেষে ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হন

অর্থাৎ লীলামঞ্চে অভিনয়ের জন্য দণ্ডায়মান হন তখন তিনি তাঁহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-শক্তির দ্বারাই নিজের স্বরূপভূত নিত্যতা প্রভৃতি ধর্ম্মকে আচ্ছাদন করেন, কারণ তাহা না করিলে লীলাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। ইহার ফলে যিনি নিত্য তিনি নিত্য থাকিয়াও লীলাচ্ছলে অনিত্য সাজেন। এই প্রকার সাজ গ্রহণ করিতে হইলে আবরণরূপা মায়ার যে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহাকে কাল-শক্তি বলে। যিনি কালের অতীত তিনি যেন খেলিতে উদ্যত হইয়া ইচ্ছা করিয়াই কালের অধীন হন। তদ্রূপ যিনি স্বভাবতঃ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক তিনি নিজের স্বরূপভূত এই বিভুত্ব ধর্ম্মকে নিয়তি-শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। নিয়তিও মায়ার অপর একটি অঙ্গ। শিবরূপী আত্মা স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞ। আত্মা সকল বস্তুকেই নিজের সহিত অভিন্নরূপে জানেন এবং তাঁহার এই জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। ইহাকে আত্মার স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্ব বলে। কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিচ্ছিন্ন হইয়া লীলাভূমিতে অল্পজ্ঞত্বরূপে পরিণত হয়। তাই পশুপতি শিব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অভিনয়-স্থলে পশুরূপী জীব অল্পজ্ঞ, ইহা সকলেই জানেন।

মায়ার অঙ্গীভূত যে আবরণ-শক্তির দ্বারা জ্ঞানের এই আচ্ছাদন কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার নাম অশুদ্ধ বিদ্যা। আত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বকর্ত্তা অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির পূর্ণ অধিষ্ঠাতা। কিন্তু লীলাস্থলে এই সর্ব্বকর্তৃত্ব নামক স্বরূপ-ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া অল্পকর্তৃত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মায়ার যে অঙ্গদ্বারা এই

স্বরূপাবস্থায় অখণ্ড স্বরূপানন্দে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভাবশূন্য ও সর্ব্বাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত। তাই তাঁহাকে আপ্তকাম বলা হইয়া থাকে। তাঁহার কোন কামনাই অপূর্ণ নহে বলিয়া তিনি আপ্তকাম বা নিত্যতৃপ্ত। কিন্তু এই নিত্যতৃপ্ত অবস্থাতে অভিনয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায় না। তাই তাঁহাতে অতৃপ্তি না থাকিলেও তিনি খেলিবার জন্য নিজের মধ্যে কৃত্রিম অতৃপ্তি রচনা করিয়া লন। মায়ার যে শক্তির দ্বারা এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাকে রাগ বলে। এইভাবে যিনি স্বভাবে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা ছিলেন তিনি মায়ার খোলসে আবৃত হইয়া জীব বা পুরুষরূপে পরিণত হন। সুতরাং আত্মা বা ভগবান্‌ই নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া ও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া পুরুষরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সত্য। যে মূল পুরুষ সমগ্র মায়াণ্ডকে নিজের কায়রূপে গণনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং যে এই মায়াণ্ডে অভিমানশীল তাহাকে রুদ্র বলিয়া আগম-শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। প্রগতিশীল যোগীও ব্রহ্মভূমি ও বিষ্ণুভূমি হইতে উত্থিত হইয়া এবং উভয় ভূমিকে শবাধার শ্মশানরূপে পরিণত করিয়া স্বয়ং রুদ্র অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। তাহার পর যখন মায়াণ্ডকে ভেদ করিয়া এই অণ্ডকেও পূর্ব্বোক্ত দুইটি অণ্ডের ন্যায় শবরূপে পরিণত করে এবং সেই শবরূপী আসনের উপর মায়াতীত চৈতন্য-সত্তারূপে নিজে অধিষ্ঠান করে তখন সে অতি শ্রেষ্ঠ যোগী। তাহাকে আমরা ত্রিমুণ্ডী-আসনের যোগী বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। সমগ্র মায়া এই যোগীর সঙ্কল্প-শক্তির অধীন।

(৬)

মায়ারাজ্যের ঊর্দ্ধে চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বময়, আনন্দময়, কালাতীত, বিশুদ্ধ মহামায়া রাজ্য। বস্তুতঃ এই মহামায়া রাজ্যও পূর্ব্বোক্ত তিনটি রাজ্যের ন্যায় অণ্ডরূপেই কল্পিত হয়। এই অণ্ড অতি বিশাল। মায়াণ্ড যতই বিশাল হউক না কেন উহা এই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ অণ্ডের ক্ষুদ্র একটি কোণে অবস্থিত। বিশালরাজ্যের মধ্যে যেমন প্রান্তদেশে অপরাধীদের দণ্ড অথবা আত্মশুদ্ধির জন্য কারাগারের ব্যবস্থা আছে তদ্রূপ এই বিশাল চিন্ময় রাজ্যের বহির্দ্দেশে, বস্তুতঃ অন্তর্দ্দেশে হইলেও বহির্দ্দেশরূপে কল্পিত ক্ষুদ্র একটি স্থানে, মায়াণ্ডটি অবস্থিত। এই বৃহত্তম অণ্ডটিকে শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে শাক্তাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শক্তি বলিতে এখানে চিন্ময়ী শক্তি বুঝিতে হইবে। এই শাক্তাণ্ডের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন বিভাগ না থাকিলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহাতে দুইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। একটির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর এবং অপরটির অধিষ্ঠাতা সদাশিব। ঈশ্বর পরমেশ্বরের তিরোধান-শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ, এবং সদাশিব তাঁহার অনুগ্রহ শক্তির প্রতীক। সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রভুর মুখ্য কৃত্য নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের ব্যাপার এই শাক্তাণ্ডেই হইয়া থাকে। যে সকল আত্মা ভগবানের স্বাতন্ত্র্যলীলাতে সঙ্কোচ প্রাপ্ত এবং অণুত্বসম্পন্ন হইয়াছে তাহারা ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহাদের সঙ্কোচের অনুরূপ বেশ গ্রহণের জন্য মায়াণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ব্যাপার নিরন্তরই হইতেছে—সমগ্র বিশ্বের

শাসন-প্রণালীর জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক। ঈশ্বর আত্মদৃষ্টির নিমেষরূপ এবং সদাশিব আত্মদৃষ্টির উন্মেষরূপ। যিনি বাম হাতে ধাক্কা দিয়া অন্ধকারময় কর্ম্মপ্রধান দুঃখবহুল মায়ারাজ্যে নিক্ষেপ করেন, তিনিই আবার দক্ষিণ হস্তে চৈতন্য-শক্তির উন্মেষের দ্বারা অন্ধকার দুঃখ ও অজ্ঞান হইতে জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দময় চিদ্‌রাজ্যে আকর্ষণ করেন। সুতরাং ঈশ্বর ও সদাশিব শাক্তাণ্ডের অধিষ্ঠাতারই বহির্ম্মুখ ও অন্তঃর্ম্মুখ দুইটি মূর্ত্তি। দিব্য যোগী মায়াভেদ করার পর শাক্তাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর ও সদাশিব দশাতে প্রথমে উপনীত হন। তখন সমস্ত শাক্তাণ্ডই তাঁহার কায়রূপে কল্পিত হয়। বস্তুতঃ অনন্তকোটি প্রকৃত্যণ্ড এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-সমন্বিত সমগ্র মায়ারাজ্য এই মহান্ কায়ের একটি অঙ্গের এক অণু প্রদেশে অবস্থিত। যোগী তখন একাধারে নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপে। কিন্তু মহাশক্তির দিকে যাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহার পক্ষে এই অণ্ডও অতিক্রম করা আবশ্যক, কারণ ঈশ্বর ও সদাশিব সমগ্র মায়িক জগতের চরম অধিষ্ঠাতা হইলেও পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যশক্তি পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যথার্থ স্বাধীনতা তাঁহাদেরও কিছু নাই। এইজন্য যোগীকে নিজের শাক্তাণ্ডরূপ মহত্তম কায়কেও শবরূপে পরিণত করিতে হয়। তখন ঈশ্বর ও সদাশিব উভয়েই নিষ্ক্রিয় শবরূপে স্থিত হইয়া আসনরূপে কল্পিত হয়। এইটিই পঞ্চমুণ্ডী আসন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, ও সদাশিব এই পঞ্চপ্রেতের

প্রাপ্ত হন না। প্রলয়ের রাজ্য অতিক্রম করিতে না পারিলে অক্ষর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দুর্ঘট। অক্ষর ব্রহ্মই পরমাত্মা পরমশিব। বিন্দুরাজ্যের ঊর্দ্ধে নাদ, শক্তি ও উন্মনা রহিয়াছে। নাদের স্তরে নাদ ও নাদান্ত এবং শক্তির স্তরে শক্তি ব্যাপিনী ও সমনা অন্তর্ভুক্ত আছে মনে করিতে হইবে। এই তিনটি ত্রিশূলের শূলত্রয়। সমনা পর্য্যন্তই মন আছে। তাহার পর মনের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থার নাম—মহাশূন্যরূপী উন্মনা। ইহা অতি কঠিন স্থান, কারণ সাধারণ কোন উপায়ে এই মহাশূন্য ভেদ করা যায় না। একমাত্র বিশ্ব-জননী মহাশক্তি প্রসন্ন হইলে তাঁহার অনুগ্রহে ইহা ভেদ করা সম্ভবপর হয়। এখানে মন নাই, প্রাণ নাই, কাল নাই, দেব-দেবী নাই, ধরা ছোঁয়ার কিছুই নাই। নিরোধিকা শক্তির বাধা ভেদ করিয়া আসিতে পারিলেও মহাশূন্য ভেদ করা চলে না। তবে মহাশক্তির কৃপা থাকিলে একদিকে যেমন রোধিনী কলা পথ ছাড়িয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি পথহীন মহাশূন্যের মধ্যেও পথ পাওয়া যায়। তখন সেতু রচনা হয় ও যাত্রী অনায়াসে বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীত চিৎশক্তির রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে।

পঞ্চমুণ্ডী আসনের পঞ্চম অঙ্গটি মহাপ্রেত সদাশিব।*

* "সদাশিবাসন"ই প্রকৃত আসন। "যোগিনীহৃদয়" তন্ত্রে আছে—'বৈন্দবাসন-সংরূঢ়-সংবর্ত্তানল-চিৎকলম্।' এই স্থলে ব্যাখ্যাকার অমৃতানন্দনাথ বুঝাইয়াছেন যে মহাবিন্দুরূপ সদাশিব-আসনই বৈন্দবাসন। যোগিনীহৃদয়েও 'সদাশিবাসনং দেবি মহাবিন্দুময়ং পরম্' এই বাক্য দ্বারা

তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন অমারূপিণী কালী। তদ্রূপ নবমুণ্ডী আসনের নবম অঙ্গটি পরমশিব। তিনি পঞ্চপ্রেতাত্মক আসনে শয়ান অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। এই নিদ্রিত পরমশিবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তি ললিতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। ইনি পূর্ণিমারূপিণী মহাশক্তি। সদাশিব প্রেত হইয়া আসনে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু পরমশিব প্রেতের উপর নিদ্রিত হইয়া আসনরূপ ধারণ

এই অভিপ্রায়ই সমর্থিত হইয়াছে। সংবর্তানল=প্রলয়াগ্নি, যে অগ্নিতে ছত্রিশ তত্ত্বরূপ বিশ্ব দগ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ শিব বা অনুত্তর প্রকাশ (=আদিবর্ণ 'অ'কার)। চিৎকলা—চিদ্রূপা বা বিমর্শময়ী ক্তি (=অন্ত্যবর্ণ 'হ'কার বা হার্ধকলা)। শিব-শক্তিরূপ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বিন্দুরূপ সদাশিব তত্ত্বের উপর স্থিত বলিয়া তাঁহাকে 'বৈন্দবাসন সংরূঢ়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে মহাবিন্দুটিকে শিব-শক্তির সামরস্যরূপ ধরা হইয়াছে। শ্রীচক্রের (অর্থাৎ বিশ্বচক্রের বা দেহচক্রের) এইটি মধ্যচক্র—বৈন্দব চক্র। ইহা হইতে ত্রিকোণের আবির্ভাব হয়—তাহাই অম্বিকাস্বরূপ। পরাত্রিংশিকার ভাষ্যে অভিনব গুপ্তও বলিয়াছেন যে পরা, পরাপরা ও অপরা পারমেশ্বরী সত্তা সদাশিব তত্ত্ব ও অনাশ্রিত শক্তি তত্ত্বেরও উপরে বিদ্যমান—কারণ ততটা পর্য্যন্তই আসন বিস্তৃত ('তদন্তস্যাপি আসনপক্ষীকৃতত্বাৎ')। আচার্য্যগণ বলেন যে দিব্যতনু-সঞ্জীবনের জন্য ক্রম মানিতে হয়। ন্যাস-প্রসঙ্গে তন্ত্রে আছে 'মহাপ্রেতং ন্যসেৎ পশ্চাৎ প্রহসন্তমচেতনম্' ইত্যাদি। এ স্থলে 'মহাপ্রেত' বলিতে সদাশিবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহার অনেক হেতু আছে। ইনি আছেন চতুষ্কিকারূপ শুদ্ধবিদ্যা-কমলের উপরে; গ্রন্থিটি হইল মায়া, দণ্ডটি অনন্ত—ইহা কলাতত্ত্ব পর্য্যন্ত স্থিত (নম্বিকার প্রান্তদেশে) ও মূলটি আধার-শক্তিমূলে।

করিয়াছেন। পঞ্চমুণ্ডী আসনকে বলা যায় মায়ের চরণ—মা শ্যামা, কিন্তু নবমুণ্ডী আসনকে বলিতে হয় মায়ের কোল—মা রাজরাজেশ্বরী ললিতা শ্রীবিদ্যা, যিনি একাধারে উমা ও দুর্গা উভয়েরই স্বরূপ। পঞ্চমুণ্ডী আসন মহাশূন্যের এপারে, কিন্তু নবমুণ্ডী আসন মহাশূন্যের ওপারে।

বস্তুতঃ নবমুণ্ডী আসন পঞ্চমুণ্ডী আসনেরই পূর্ণতম স্বরূপ। কারণ সদাশিবাসনই ত প্রকৃত আসন। সদাশিবই মহাবিন্দু—এই মহাবিন্দুই মায়ের কোল। পূর্ব্বে যে উন্মনার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনটি শুদ্ধ স্থিতি আছে—তন্মধ্যে প্রথমটি ঊর্দ্ধ-কুণ্ডলীপদ ; দ্বিতীয়টি পরমধাম এবং তৃতীয়টি শ্বেতকমল। এইখানেই বিশ্বময় ভেদ তিরোহিত হইয়া সামরস্য প্রাপ্তি ঘটে। এইটিই পরম আসন। ইহাই বাস্তবিক মায়ের কোল।* এইখানে যিনি স্থান লাভ করেন, এখানে যিনি উপবিষ্ট, ইহার যিনি ব্যাপক ও আধেয়, তিনিই সেই **পরমবস্তু।**

---

† পূর্ব্বে যে মহাপ্রেত সদাশিবের কথা বলা হইয়াছে তাঁহার নাভি হইতে উত্থিত ও তাঁহার মূর্ধরন্ধ্র হইতে নির্গত তিনটি ধারা আছে—সব নাদান্তবর্ত্তী। এইটি দ্বাদশান্ত স্থিতির কথা। ইহার উপরে অর্থাৎ ত্রিশূলের তিন শৃঙ্গের উপরে তিনটি শাক্ত কমল আছে। এইগুলি মনোরাজ্যের অতীত উন্মনা পদের অন্তর্গত। ইহাদের নাম—ঊর্দ্ধকুণ্ডলী, পরমধাম ও শ্বেতকমল। শেষটি সর্ব্বাধিষ্ঠায়ক পরম আসন বা মায়ের কোল। এখানেই জ্ঞানশক্তির পরম প্রকাশ—এইটিই বাস্তবিক পত্তন্ত্রীভূমি। ইহার পর পরাভূমি ভগবতী স্বয়ং, যেখানে " সর্বমভেদেনৈব ভাতি চ বিমৃশ্যতে চ।"

(৮)

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেব তত্ত্ববিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"জগৎ-প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা-যোগে ব্রহ্মাতীত মা মহাভাব-তত্ত্বের সার মর্ম্ম ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ে সর্ব্বদাই গ্রহণ কর।" তাঁহার এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহাকে এই স্থলে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাঁহারই অন্তর্গতরূপে মায়ের যে স্বরূপ অনুভব করা যায় তাহা সাক্ষাৎকারের বিষয়। এই মাকে প্রত্যক্ষ করাই যোগীর প্রথম লক্ষ্য, কারণ ইনি জগৎকে প্রসব করিয়াছেন। জীব, ঈশ্বর ও জড়, এই তিন প্রকার সত্তাই এই স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইনিই জগদম্বা—যোগী সন্তানরূপে এই মাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যক্ষের ফলে এই মায়ের সঙ্গেই যোগী যুক্ত হইয়া অভিন্নতা লাভ করেন। কিন্তু মায়ের যেটি পরম স্বরূপ তাহার সাক্ষাৎকার ঐ সময়ে হয় না, কারণ তিনি ব্রহ্মের অতীত। তাঁহাকে ব্রহ্মাতীত মা বলিয়া উক্ত বাক্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি যে 'মহাভাব'-স্বরূপা তাহারও ইঙ্গিত উক্ত বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। তিনি জগৎ-প্রসবিনী নহেন, তাই সৃষ্ট প্রপঞ্চের সহিত এক দৃষ্টিতে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

যিনি প্রত্যক্ষ হন তিনি জগৎ প্রসবিনী মূল প্রকৃতি, কিন্তু যিনি মহাভাবরূপা মা তাঁহাকে ঐরূপ প্রকৃতি বলা চলে না, কারণ তাঁহার স্বরূপে পুরুষ-প্রকৃতির কোন ভেদ নাই। তাঁহাকে পুরুষও বলা চলে, প্রকৃতিও বলা চলে, আবার তিনি এক সঙ্গে

উভয়াত্মক অথচ উভয়ের অতীতও বটে। তিনিই আনন্দ বা রসস্বরূপ। রস ও প্রেম একই বস্তু, তাই তাঁহাকে মহাভাবরূপা বলিয়া বর্ণনা করা সুসঙ্গত। তাঁহার কথাই শ্রীশ্রীগুরুদেবের একটি গানের পদে উল্লিখিত আছে—"ব্রহ্ম যাঁরে ব্রহ্ম ভেবে পূজেন দিয়ে বিল্বদলে।"

(৯)

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটি একই বস্তু। কিন্তু প্রত্যেকটিতে ভাবগত ভেদ আছে। তদনুসারে তিনটি পৃথক্ ভাবের দিক্ আছে, অথচ বস্তু অভিন্ন। সৎভাবটি ব্যাপক —সৎএর কিয়দংশ চিৎ, কিয়দংশ আনন্দ। চিৎ-ব্রহ্ম বলিতে বুঝায় সৎ-চিৎ-ব্রহ্ম এবং আনন্দ-ব্রহ্ম শব্দের তাৎপর্য্য সদানন্দ ব্রহ্ম। প্রথমটি অক্ষর ব্রহ্ম, দ্বিতীয়টি রস-ব্রহ্ম। এই রস-ব্রহ্মই পরম পুরুষ, উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। অক্ষর ব্রহ্মে আনন্দের কিঞ্চিৎ কণা প্রকট রহিয়াছে এবং রস-ব্রহ্মেও চিৎ-ভাব বিদ্যমান আছে। চিৎ ও আনন্দ উভয়ই যেখানে তিরোহিত এমন একটি দিক্ও ব্রহ্মস্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাকে সৎ-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। প্রচলিত ক্ষর পুরুষ ইহারই একটা দিক্‌কে নির্দ্দেশ করে।

এই যে আনন্দের কথা বলা হইল ইহাই অখণ্ড প্রেমতত্ত্ব, যাহাতে আশ্রয় ও বিষয়ের সামঞ্জস্য অদ্বয়রূপে নিত্য বর্ত্তমান। এই আনন্দের একটি স্থিতি আছে, তাহাকে ঘনীভূত আনন্দ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা অদ্বৈত স্বভাব। কিন্তু ইহার আর একটি স্থিতি আছে যেখানে এই আনন্দ অপেক্ষাকৃত

তরলরূপে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রীড়াশীল। আনন্দ যখন ঘনভাবে থাকে তখন উহা শান্ত, স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু দ্রুত অবস্থায় উহা সর্ব্বদাই লীলায়িত। এই লীলার মধ্য দিয়াই আনন্দের আস্বাদন ঘটে। ঘনীভূত আনন্দের আকার আছে, কিন্তু ঐ আকার অচিন্ত্য ও অব্যক্ত। তরল আনন্দও সাকার, কিন্তু ঐ আকার অনন্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন। রসময় ব্রহ্মের নিত্য লীলাস্থান, লীলাপরিকর, লীলার উপযোগী যাবতীয় সামগ্রী, সবই ঐ আনন্দে গঠিত। লীলারাজ্যে লীলার উপযোগী সকল রূপই আছে, পুরুষরূপও আছে এবং প্রকৃতি রূপও আছে। কিন্তু বস্তুতঃ সকলেরই স্বরূপ এক ও অভিন্ন। এই স্থানের প্রকৃতি ঠিক প্রকৃতি নহে, ইহা স্বরূপ-শক্তি মাত্র। পুরুষরূপে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও স্বরূপ-শক্তি, প্রকৃতিরূপে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও তাই। স্বরূপ-শক্তি যেখানে অন্তর্লীন অথবা সমরস, সেখানে পুরুষও নাই, প্রকৃতিও নাই, প্রকৃতির বিস্তারও নাই, ধাম লীলা গুণ ক্রিয়া কিছুই নাই, অথচ সবই আছে এক অদ্বয় স্থিতিরূপে।

তরল অবস্থাটি আস্বাদনের অবস্থা, সেখানে অনন্ত প্রকার আস্বাদন আছে ও প্রতি আস্বাদনের অনন্ত প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু মূলে সে একই সত্তা, অর্থাৎ সেই ঘনীভূত আনন্দ। দ্রুতি অনন্ত প্রকার ও তাহার খেলাও অনন্ত প্রকার। তরলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীলার বৈচিত্র্য অনন্ত প্রকারে বিকসিত হয়। তরলতার অপগমে একই পরম রস নিত্য বিরাজমান থাকে।

লীলার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি অবস্থা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে

একটি মিলন ও অপরটি বিরহ। মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, এইরূপ আবর্ত্তন পর্য্যায়রূপে চলিতেছে। পক্ষান্তরে মিলনের মধ্যেই বিরহ এবং বিরহেই মিলন, এইরূপ আস্বাদনও আছে। আবার, মিলনই বিরহ ও বিরহই মিলন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মের আনন্দাংশে এই খেলা চলিতেছে, ইহা নিত্যলীলা। এইটিকে কেহ উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তমভূমি বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্যের একটি দিক্‌মাত্র। ইহার যথার্থ রহস্য কি তাহা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বস্তুতঃ ইহা যে পূর্ণ ব্রহ্মই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইনি অদ্বৈতরূপিণী 'মা'। যতদিন সন্তান শিশু ও অপরিণত থাকে ততদিন ইনি সন্তানকে কোলে করিয়া বিকাশের পথে সাহায্য করেন। সন্তান সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হইলে, 'মা' তখন সন্তানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তখন সন্তান হয় পুরুষোত্তম ও, মাতৃভাব অপ্রকট হয়।

ব্রহ্মের চিৎ-অংশে আছেন অক্ষর ব্রহ্ম। ইনি চিৎস্বরূপ। ইঁহার প্রকৃতি চিৎশক্তি—ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া ইঁহারই ধর্ম্ম। সাধারণতঃ ইচ্ছাময়ী বলিয়াই ইঁহাকে বর্ণনা করা হয়। ইনি অক্ষরপুরুষের হৃদয়রূপ কমলের কর্ণিকাতে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে বাস করেন।

উত্তম পুরুষের প্রকৃতি আনন্দরূপা বা হ্লাদিনী। ইনি উত্তম পুরুষের সহিত অভিন্ন। এক অবস্থায় ইনি পুরুষের জননীস্বরূপা, কিন্তু জগৎ-প্রসবিনী নহেন। পক্ষান্তরে পুরুষ যখন পুরুষোত্তমরূপে বিকাশপ্রাপ্ত তখন ইনি হ্লাদিনীরূপে

তাঁহাকে আনন্দ দান করেন। উভয় অবস্থাতেই পুরুষের সহিত ইনি সঙ্গত-অভিন্ন। ইনি উত্থিত হন মিলন অথবা সংযোগ-লীলার রচনার জন্য। বিপ্রলম্ভা লীলাতে ইঁহার সাক্ষাৎ কোন উপযোগ নাই। শ্রীগুরুদেব যাঁহাকে মহাভাবরূপা মা বলিয়াছেন ইনিই সেই চিদানন্দরসময়ী মা। ইনি অক্ষর ব্রহ্মের অতীত। চিৎশক্তিরূপা ইচ্ছাদিময়ী বিশ্বসৃষ্টির হেতুভূতা মূল প্রকৃতিরূপা মা শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভাষায় জগৎ-প্রসবিনী প্রত্যক্ষ 'মা'। ইনি উত্থিতা হন বিরহলীলার আয়োজনের জন্য। মনে রাখিতে হইবে, অক্ষর পুরুষ চিদ্‌রূপ, অক্ষর প্রকৃতিও চিদ্‌রূপা। আনন্দরূপা শক্তিতে ইচ্ছা থাকে না, চিৎশক্তিতে ইহার উন্মেষ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। প্রপঞ্চ সৃষ্টির মূলে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়। উভয় পুরুষই সাকার এবং উভয় প্রকৃতিও সাকার। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপে এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে আকার নাই। কেন্দ্র হইতে যেমন আলো বা প্রভা নির্গত হয় এবং চারিদিকে ছড়াইয়া যায় তেমনই অক্ষর পুরুষের অঙ্গবিশেষের (নখের) প্রভা হইতে প্রভা নির্গত হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া নিরূপণ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক মনে হয় না। অবশ্য ইহা পুরুষ-প্রকৃতি বিলক্ষণ ব্যাপক জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু এরূপ কোন জ্যোতিঃ নহে, যাহা কেন্দ্র বিশেষ হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

উত্তম পুরুষ বা উত্তমা প্রকৃতির স্থিতিতে কয়েকটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। একটি আপাতদৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতির কায়গত পৃথক্ প্রতিভাসময়। দ্বিতীয়টি একই কায়ার একাঙ্গে

পুরুষ ও অপরাঙ্গে প্রকৃতি, এইরূপ প্রতিভাসময়। ইহার পর আর একটি স্থিতি আছে, যেখানে একই মাত্র আকার এবং উহা স্বগত-ভেদহীন নিরবয়ব। উহাকে পূর্ণ-পুরুষও বলা চলে এবং পূর্ণ-প্রকৃতিও বলা চলে,—উহাতে অঙ্গগত ভেদ নাই। দৃষ্টিতে যে প্রতিভাস ফুটিয়া উঠে তাহা একই, পুরুষই হউক বা প্রকৃতিই হউক, অথবা এমন কিছু যাহার নাম মানবীয় ভাষায় থাকিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা বিশ্বাতীত অথবা সৃষ্টির বাহিরের মহাসত্তার কথা, যেখানে সৃষ্টির তরঙ্গ এখনও উঠে নাই, দৃশ্য এখনও ফোটে নাই, জীব জগৎ ও ঈশ্বর এখনও প্রকট হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত আনন্দের লীলাতে যখন স্বাভাবিক নিয়মে সংযোগের পর বিপ্রলম্ভ জাগিবার সময় আসে তখন নিত্য মিলনের মধ্যে ভাবী বিরহের সূত্রপাত ঘটিয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তির অচিন্ত্য মহিমাতে ইহা সম্ভবপর হয়। পুরুষোত্তমের অথবা মহাভাবরূপা 'মা'র আনন্দময় নিকেতনে ইচ্ছার কোন স্থান নাই, অথচ ইচ্ছাও ত সেই মহামায়ারই এক রূপ, তাহাও ঐ মহাশক্তির একটি সনাতন ধারা। তাই লীলার পুষ্টির জন্য ইচ্ছার উন্মেষ হইয়া থাকে। অক্ষর পুরুষের চিৎশক্তিতে ইচ্ছা সুপ্ত থাকে, অক্ষর পুরুষে কিঞ্চিৎরূপে আনন্দসত্তা থাকার দরুণ পুরুষোত্তমের রসময়ী লীলা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়। অক্ষর পুরুষ ঐ লীলা দর্শন কোথায় করেন? বস্তুতঃ ঐ লীলা-দর্শন তাঁহার নিজের হৃদয়াকাশেই ঘটিয়া থাকে। উহাই চিদাকাশ—নিত্য গোলোক ও নিত্য বৃন্দাবন আভাসরূপে এই

চিদাকাশেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভাবরূপা আনন্দশক্তির বিহার-স্থান উহাই।

বস্তুতঃ অক্ষর ব্রহ্ম অসঙ্গ, নির্গুণ, নির্ম্মল, মাত্রাহীন, শব্দহীন, স্বরব্যঞ্জনহীন, বিন্দুনাদকলাহীন প্রণবাক্ষর মাত্র। পক্ষান্তরে রসব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম। অক্ষর পুরুষের বস্তুতঃ ঐ লীলাতে প্রবেশ করিবার কোন অধিকারই নাই, কারণ কোন পুরুষ পুরুষভাব লইয়া ওখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। ওটি এক পুরুষ ও অনন্ত প্রকৃতির রাজ্য। ঐ স্বয়ংপ্রকাশ পুরুষের নিকট সকলেই প্রকৃতি। পুরুষভাব লইয়া গেলে পুরুষের দর্শন পাওয়া যায় না। সেই এক পুরুষই যখন একমাত্র পুরুষ তখন যাবতীয় পুরুষমাত্র মূলতঃ প্রকৃতি। তাই প্রকৃতি ভাব লইয়া পুরুষকে উপাসনা করিতে হয়, সন্তান ভাব লইয়া জননীকে উপাসনা করিতে হয়। তৃষ্ণার ভাব নিজের মধ্যে পূর্ব্বে না জাগিলে সুগন্ধি সুশীতল জল পাইলেও সমুচিত তৃপ্তির উদয় সম্ভবপর হয় না।

(১০)

যাহাই হউক, অক্ষর পুরুষকেও পরিশেষে ঐ লীলাতে প্রবেশ করিতেই হইবে নতুবা পূর্ণত্ব নাই। কিন্তু উহা এখন নহে, উহা ভবিষ্যতের ব্যাপার। ত্রিকাল যখন এক কালে পরিণত হইবে তখন সেই এককালই নিত্য বর্ত্তমান অথবা 'মহাক্ষণ'রূপে প্রকাশ পাইবে। অনাদিকাল হইতে অক্ষর পুরুষ পরম পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই আশাই জাগাইয়া রাখিয়াছে। আজিও সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। অক্ষর পুরুষ তাই যেন কিসের

গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন, যেন মহাসমাধিতে আছেন। এই চিন্তার বিষয় আর কিছুই নয়, সেই অপূর্ব্ব আনন্দের লীলা। এই চিন্তার ফলেই তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে মহাশক্তি জননী প্রকট হইয়া মহামোহরূপ নিদ্রা উৎপাদন করেন ও সেই মোহনিদ্রাতে অক্ষর পুরুষকে আচ্ছন্ন করেন। এই মোহরূপা নিদ্রাই ঘোর তমোময় মহাশূন্যাত্মক আবরণরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা অক্ষর পুরুষকে ঘিরিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা অক্ষর পুরুষের আবরণ নহে, অক্ষর পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট স্বাপ্নিক জগতের সৃষ্টির আবরণ। এই মহাশূন্যটি যেন অপার ও অনন্ত সমুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অক্ষরপুরুষের স্বপ্নদর্শনে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টিরূপে প্রতিভাসমান হয়। তাঁহার দৃষ্টিই সৃষ্টি। আমরা যে অবস্থার কথা বলিতেছি তখন কোন দৃশ্য পদার্থ নাই, মোহমুগ্ধ দ্রষ্টার দৃষ্টি হইতে যেন দৃশ্যের উদ্ভব হয়। সত্যই যে তিনি দেখেন তাহাও বলা যায় না; কিন্তু মনে হয় যেন তিনি দেখেন। তাই এই সৃষ্টিটি প্রতিভাস মাত্র—বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাঁহার হৃদয়ে ইচ্ছাময়ী মা'য়েরই লীলা বিস্তার ভিন্ন অপর কিছু নহে। আত্মা স্বেচ্ছায় নিজের শক্তির দ্বারা বিমোহিত হন, ইহাও যেমন সত্য, তেমনি তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে নিজের স্বরূপ-ভিত্তিতেই সমগ্র বিশ্বকে ফোটাইয়া তোলেন, ইহাও তেমনি সত্য। বিশ্বচিত্র অঙ্কনের জন্য তিনি নিজ হইতে পৃথক্ প্রচ্ছদপটের প্রতীক্ষা করেন না। দ্বৈত ভূমিতে ঈশ্বর শূন্যকে অধিকরণ করিয়া তাহারই মধ্যে সঙ্কল্পানুরূপ দৃশ্যের অবতারণ করেন। এইটি অতি রহস্য লীলা।

ইহা অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপের হৃদয়ে যেন জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া নিয়ত স্ফুরিত হইতেছে। মানুষ জাগতিক কোন উপায় বা সাধন দ্বারা এই লীলা দর্শন করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় না। মা'য়ের কৃপাপ্রাপ্ত জন তাঁহারই কৃপাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দর্শনের অধিকার লাভ করে। ইচ্ছাময়ী মা'য়ের অনুগ্রহরূপা ইচ্ছা উদিত হইলে পরমাত্মার নিদ্রারূপী ঐ মহাশূন্যের মধ্যে চিদ্‌বৃত্তির উন্মেষ হয়, অন্ধকার দূরীভূত হয়, যেন তমোময় মহাশূন্যের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রভাব ন্যায় একটি সেতুর রচনা হয়। তারপর ঐ সেতু ধরিয়া সাধকের প্রকৃত চক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন মহাশূন্য পার হইয়া সাধক অতর্কিতভাবে মা'য়ের শ্রীপাদ-সন্নিধানে উপনীত হয়।

অক্ষরপুরুষ যে মহানিদ্রাতে মগ্ন আছেন ঐ নিদ্রাটি মূল অজ্ঞান; প্রচলিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে তিনি যে শয্যাতে শয়ান আছেন তাহার ফলক অজ্ঞানের একটি বৃত্তি ও ঐ ফলক পর্য্যঙ্কের যে চারিটি পাদের উপর বিছানো আছে ঐগুলি অজ্ঞানের অবশিষ্ট চারিটি বৃত্তি। প্রাচীনকালে এই পাঁচটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, অথবা তামিস্র অন্ধতামিস্র প্রভৃতি, অথবা নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত এই পাঁচটি কলা অথবা আপ্যায়নী, ধারিণী প্রভৃতি বৃত্তি—সব এই মূল পাঁচেরই প্রতীক। সাধক তখন এই পঞ্চ কারণ-দেবতার অধিকারে বর্ত্তমান থাকে।

এই মহামোহরূপ নিদ্রার মধ্যে যিনি স্বপ্নজগতে স্বাপ্নিক

আত্মবোধ লইয়া জাগ্রৎ হইলেন তিনি প্রণব-পুরুষ নারায়ণ। শব্দব্রহ্ম ইঁহারই নামান্তর। প্রণবের পাঁচটি অবয়বে যে পাঁচটি দেবতা আছেন তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মা হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত পাঁচ স্তরের অধিষ্ঠাতা। এই অন্ধকারময় নিদ্রারূপী মহাশূন্যই হইল কারণ-সমুদ্র। শব্দব্রহ্মে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া একটি অভিমান জাগিল, 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণাত্মক জগৎ-ই 'অ'-'হ', তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে বিন্দু, ইহাই 'অ হ ম্' এর বিন্দু, যাহা শূন্যের নামান্তর এবং যাহাতে বাচ্য-বাচক কিছুই নাই। মোহ চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া মাত্রা স্বর প্রভৃতির দ্বারা যে চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে তাহারই নাম প্রণব বা শব্দব্রহ্ম। ইহার মধ্যে নাদ-ই সমগ্র বিশ্ব, নাদান্ত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং বিন্দু হইল জ্যোতির ঘের, যাহা জ্যোতিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বিন্দুই নিদ্রা বা মোহ, যাহা হইতে নাদ ও জ্যোতি স্ফুরিত হইয়া তাহারই অভ্যন্তরে আত্মপ্রকাশ করে।

অক্ষরপুরুষ শুইয়া আছেন মহাকারণ-মঞ্চে, কিন্তু প্রণব-পুরুষ শুইয়া আছেন কারণ-সলিলে। কেহ কেহ এই প্রণব-পুরুষকেই যে নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, ইহা বলিয়াছি। অক্ষরপুরুষ কূটস্থ বা সাক্ষিচৈতন্য, ইনি সকলের দ্রষ্টা—ইঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। ইনি সকলের আত্ম-স্বরূপ। ইঁহাকে দর্শনের নামই আত্মদর্শন। কিন্তু স্বভাবের বিচিত্র লীলায় কূটস্থ পুরুষ দ্রষ্টা হইয়াও এখন আত্মবিস্মৃত। ইনি সবই দেখেন, কেবল নিজেকে দেখেন না, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই ইঁহার দৃষ্টিসম্ভূত। কিন্তু এই দৃষ্টি নিদ্রাবিষ্ট দৃষ্টি এবং দৃশ্য স্বাপ্নিক

দৃশ্য। ইনি যখন নিদ্রা হইতে জাগিবেন তখন স্বপ্ন থাকিবে না এবং স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যও থাকিবে না। তখন স্বভাবতঃ সকলেরই আত্মদর্শন হইবে। প্রণব-পুরুষরূপে ইনিই তো বহু হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাই ইনি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলে বহুরও আত্মদর্শন ও স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইবে।

প্রণব-পুরুষ অক্ষরপুরুষেরই বিভূতি, তথাপি উভয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। অক্ষরপুরুষ মোহনিদ্রাতে নিদ্রিত, তাঁহার 'আমি' বলিয়া অভিমান নাই। তিনি নির্ব্বিকার 'কূটস্থ'-স্বরূপেই রহিয়াছেন, মোহ তাঁহার কায় নহে। কিন্তু যিনি এই মোহ হইতে অথচ মোহ মধ্যেই উত্থিত হন, তিনি প্রণব-পুরুষ, তিনি মোহকে স্বীয় কায়রূপে বরণ করেন। তাঁহাকেই কারণার্ণবশায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখেন কোথাও কিছু নাই; চারিদিকে অনন্ত মহাশূন্য বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তিনি নিজে একেলা—একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই। তখন তিনি বহু হইবার সঙ্কল্প করেন,—'আমি বহুরূপে অথবা বিশ্বরূপে অর্থাৎ অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠিব', এইরূপ একটি অব্যক্ত ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে জাগে। এইখান হইতেই তত্ত্বসৃষ্টি আরম্ভ হয়।

প্রণব-পুরুষ বিন্দু-অভিমানী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে পৃথক্ পৃথক্ 'গুণের' আবির্ভাব হয়—শুদ্ধভাগে বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ হয় এবং মিশ্রভাগে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি মিশ্রগুণের আবির্ভাব হয়। এই চারিটি বিন্দুরই অন্তর্বিভাগ,—বিশুদ্ধ সত্ত্ব অংশে যেমন প্রণব-পুরুষের প্রতিবিম্ব

সঞ্চারিত হয় তেমন অন্যান্য তিন অংশেও হয়। ইঁহারা প্রণব-পুরুষেরই চারিটি রূপ জানিতে হইবে। যাঁহারা চতুর্ব্যূহ স্বীকার করেন তাঁহারা প্রকারান্তরে এই মূল চারিটি বিভাগকেই লক্ষ্য করেন।

প্রণব-পুরুষ ও তাঁহার ইচ্ছা উভয়ই এক হিসাবে অক্ষর-পুরুষের প্রতিভাস মাত্র। তাত্ত্বিক সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ হইতে ইঁহারাই শিব-শক্তিরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রণব-পুরুষের যে অনন্তরূপে ফুটিয়া উঠিবার ইচ্ছা তাহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। এই সমগ্র বিশ্ব শক্তি-স্বরূপে বীজরূপে নিহিত থাকে, তিনি যখন যেমন উদ্গিরণ করেন তখন তেমনি ইহা ফুটিয়া উঠে। এই বিশ্বের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য — কেহ ইহাকে অহং-রূপে ধারণা করে, কেহ ইহাকে ইদং-রূপে ধারণা করে। বস্তুতঃ যে অহং-রূপে ধারণা করে সে জানে এই বিশ্ব ইদং-রূপে অহংকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিভাসমান হইতেছে। ইদং-রূপে প্রতিভাস যাঁহার হয় না, যাঁহার নিকট সবই অহং-রূপ, তিনি পূর্ণ-অহং স্বয়ং শিব। এই অহং-রূপের মধ্যে ইদং-ভাবের স্ফুরণের একটা ক্রম আছে, তদনুসারে বিশ্বের স্তর-বৈচিত্র্য ধারণা করিতে হয়। যেমন একটা স্থিতি আছে যেখানে ইদং-ভাব মোটেই ফোটে না, তেমনি এমন একটি স্থিতিও আছে যেখানে ইদং-ভাব এত প্রবল হয় যে অহং-ভাবের প্রকাশ তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইভাবে মায়াস্তরে এবং ক্রমশঃ কর্ম্মবীজের প্রাকট্য ও বিকাশের ক্ষেত্রে অবতরণ হয়। তাহার পর একটি বিচিত্র স্থিতির উদয় হয়—তখন ইদং-ভাবাপন্ন বস্তুই প্রবল হইয়া নিজের মধ্য হইতে অহং-ভাবকে

কোটাইয়া তোলে। বস্তুতঃ এই সকল অহং পূর্ব্ববর্ণিত প্রণব-পুরুষেরই ভিন্নাংশ। এই সকল খণ্ড অহং চিৎকণরূপে কর্ম্মযুক্ত হইয়া তদনুসারে শুভ ও অশুভ গতি প্রাপ্ত হয় এবং লোক-লোকান্তরে ফলভোগের জন্য সঞ্চরণ করিতে থাকে।

তত্ত্ব-সৃষ্টির পর তত্ত্ব সকলের সংঘটনের ফলে অণ্ড-সৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন ঐ অণ্ড মধ্যে প্রণব-পুরুষ অন্তঃপ্রবিষ্ট হন, এবং অণুরূপে বিচিত্র দেহের অভিমানী হইয়া চতুর্দ্দশ প্রকার মৌলিক ভূতসর্গের বিস্তার করেন। বস্তুতঃ সৃষ্টির ধারা অনন্ত। চৌরাশি লক্ষ যোনি বলিলেও ধারার শেষ বলা হয় না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে এত বড় বিশাল সৃষ্টি অক্ষর-পুরুষের স্বপ্নদর্শন মাত্র। তাঁহার স্বপ্নদর্শন অথবা তাহার মূলভূত আদিম অজ্ঞান যতদিন নিবৃত্ত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের সামূহিকরূপে আত্মদর্শন, অর্থাৎ প্রকৃত আত্মদর্শন, অসম্ভব।

(১১)

এই বিশ্ব যে কত বিশাল তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করি না। বহুদিকেই এই বিশালতা লক্ষিত হয় এবং চিত্তকে স্তম্ভিত করে। দেশগত এবং কালগত বিশালতা চিন্তা করিলে মানব-হৃদয় নিজের ক্ষুদ্রতাতে চিন্তা-রহিত হইয়া পড়ে। যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পৃথ্বীতত্ত্বকে প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক হিসাবে দেখিতে গেলে পৃথিবীকে মূল উপাদান ধরিয়া যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিকেই পৃথিবী বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীতত্ত্বে যেমন অসংখ্য অণ্ড আছে, তদ্রূপ উহাতে বহুসংখ্যক ভুবনও আছে। পৃথিবীতত্ত্ব নিবৃত্তি-কলাতে আশ্রিত। তদ্রূপ দ্বিতীয় কলা প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করিয়া বহুসংখ্যক প্রকৃত্যণ্ড রহিয়াছে, তদ্রূপ বহু ভুবনও আছে। সেই প্রকার মায়াতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বিশাল মায়াণ্ড রহিয়াছে এবং তদনুরূপ ভুবনও আছে। শক্তি-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি-অণ্ড আছে তাতেও স্তরে স্তরে বহুসংখ্যক ভুবন আছে। ব্যাপকতার দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে সদাশিবের রাজ্য অতি বিশাল, উহাকে এক প্রকার বিশালতম রাজ্যও বলা যাইতে পারে। এক একটি সৃষ্টির স্থিতিকালও কম নহে। ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকাল ও ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল একই। সত্য প্রভৃতি চারি যুগের সমষ্টির নাম যদি এক মহাযুগ হয়, তাহা হইলে একাত্তর মহাযুগের সমষ্টি একটি মনুর শাসন কাল হয়। পর পর চৌদ্দ জন মনু ব্রহ্মার একটি দিনের মধ্যে শাসন-কার্য্য চালনা করিতেছে। সুতরাং চৌদ্দটি মনুর স্থিতিকালের সমষ্টি ব্রহ্মার একদিন মাত্র এইরূপ তাঁহার রাত্রিও আছে, যখন সমগ্র সৃষ্টি লীন হইয়া যায়। এই প্রলয়কে কল্প-প্রলয় বলে। এই প্রকার অহোরাত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়ের আবর্ত্তন চলিতেছে। তদনুসারে ব্রহ্মার শতবর্ষ পরিমিত আয়ু নিঃশেষ হইলে তাঁহার দেহস্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডটি ধ্বংস হইয়া যায়। ইহারই নাম মহাপ্রলয়। কল্প-প্রলয়ে ত্রিলোকের অবসান হয়, তাহার কারণ এই, তাঁহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সংস্কার ত্রিলোকের উপাদান হইতে উদ্ভূত, কিন্তু মহাপ্রলয়ে সমগ্র অণ্ড এবং তাহার আনুষঙ্গিকভাবে যাবতীয় লোক মায়াতে

লীন হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মা অধিকার-মল হইতে মুক্ত হন। ব্রহ্মাণ্ডের নাশ ও ব্রহ্মার দেহত্যাগ একই কথা। তবে এক ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইলেও অন্য ব্রহ্মাণ্ড থাকে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড এক সঙ্গে লীন হইতে পারে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যখন এই অসম্ভবও সম্ভবপর হইবে, তখন আর একটি স্তর খুলিয়া যাইবে, ইহার নাম প্রকৃতি-স্তর, যাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার শতবর্ষ পরিমিত আয়ুষ্কালে, বিষ্ণুর একদিন মাত্র অতিবাহিত হয়। তদনুসারে বিষ্ণুরও শতবর্ষ পরিমিত আয়ু জানিতে হইবে। বিষ্ণুর সমগ্র আয়ুর কাল রুদ্রের একদিন। কিন্তু রুদ্রও আপন মান অনুসারে শতবর্ষ জীবন ধারণ করেন। রুদ্রের শতবর্ষ ঈশ্বরের একদিন মাত্র। তদ্রূপ ঈশ্বরও নিজের পরিমাণ অনুসারে শতবর্ষ জীবিত থাকেন, তাহার পর তিনিও ব্রহ্মাদি ত্রিদেবের ন্যায় প্রেত-অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঠিক এই প্রকারে সদাশিবের অবস্থাও হইয়া থাকে। সদাশিবের দেহরূপ বিশ্ব সঙ্কোচ-ভাব প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চপ্রেতের আবির্ভাব হয়। ইহা সুদীর্ঘতম কালের কথা। স্বভাবের নিয়ম অনুসারে এই পঞ্চপ্রেত অবস্থার উদয় হয়। ব্যাপকতম দেশ ও ব্যাপকতম কালের অভিনয় এইখানে সমাপ্ত হয়।

কিন্তু যে যোগী নিজের পুরুষকার বলে প্রতি স্তরের কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সেই স্তরের অধিষ্ঠাতার সাম্য লাভ করেন এবং পরে তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে প্রেতাসনরূপে গ্রহণ করেন, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সুদীর্ঘ কালের কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে সমর্থ হন। পঞ্চস্তরের কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে এবং

পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর বসিতে পারিলে ক্রমশঃ বিশ্বাতীত হইয়া পরমশিবের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। ইহাই পঞ্চমুণ্ডী আসনের কর্ম্মের রহস্য। স্বভাবের নিয়মে যাহা সুদীর্ঘ কালে হওয়ার কথা, তাহা উপায় এবং সংবেগের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভবপর। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা ব্যক্তিগত কর্ম্ম। এই কর্ম্মটি মায়ের একটি প্রধান রূপের চরণ আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিতে হয়—ইনিই আদ্যাশক্তি। মহাশূন্য ভেদও ইহারই অন্তর্গত। ইহার পর নবমুণ্ডী আসনের কর্ম্ম পরমশিবের বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী মহাশক্তির অঙ্ক আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ইনিই ললিতা, রাজরাজেশ্বরী, ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতি নানা নামে বর্ণিত হন। পঞ্চমুণ্ডী আসন যেমন সদাশিবরূপী আসন, তদ্রূপ নবমুণ্ডী আসন পরমশিবরূপী আসন। সদাশিবের বক্ষঃস্থলে মহাশক্তির যে রূপ বিরাজ করে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চমুণ্ডী আসনের কর্ম্ম হইয়া থাকে। তদ্রূপ পরমশিবের হৃদয়-বিহারিণী মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নবমুণ্ডী আসনের কার্য্য হইয়া থাকে।

পঞ্চমুণ্ডী আসন বিশ্বের অতীত সত্য, কিন্তু এই বিশ্ব পঞ্চ ব্রহ্মময় কার্য্য বিশ্ব—চারিটি অণ্ড ইহার অন্তর্গত। ইহা বিশ্বের কারণ-সত্তার অতীত নহে। নবমুণ্ডী আসন কারণ-সমুদ্রের, এমন কি মহাকারণ-মঞ্চেরও, অতীত—বস্তুতঃ নিদ্রামগ্ন পরমশিব পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। পঞ্চমুণ্ডী আসনের কর্ম্মের লক্ষ্য মহাশূন্য বা উন্মনা ভেদ করা, কিন্তু তাহাতেও পরমাত্মার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তাঁহার স্বপ্নদর্শন বন্ধ হয় না এবং সমগ্র বিশ্ব আত্মস্বরূপে-প্রতিষ্ঠিত হয় না।

নবমুণ্ডী আসনের কর্ম্ম ব্যতীত পরমশিবের নিদ্রা-ভঙ্গ হইতে

পারে না, বিশ্ব-মায়ার নিবৃত্তি ঘটে না এবং সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণ—যাহাতে নিজেরও পরম কল্যাণ—সম্ভবপর হয় না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত আসন পূর্ব্ব-বর্ণিত এই মহাসনেরই জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ। ইহার অধিক গুহ্যতত্ত্বের আলোচনা করা আমার পক্ষে সঙ্গত মনে হয় না। তবে এই আসনের কর্ম্ম-রহস্য সম্বন্ধে "জ্ঞানগঞ্জ" বিষয়ক প্রবন্ধে ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা রহিল। জয় গুরু।

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব রচিত

গীতাবলী

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

('বিশুদ্ধবাণী" দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত গীতাবলীর অনুবৃত্তি)

(৩১)

(বাগেশ্রী)

এমন কঠিন মেয়াদে

তারা, ক'দিন রাখ্‌বি সংসার গারদে।

মেয়াদ হুকুম দিয়ে পাঠালি যে দিনে,

কত দিন নিয়ম নাই আমার মনে,

আর ত বাঁচিনে

খালাস হ'ব কোন দিনে

মা, তাই ব'লে দে।

মাগো, উঠি প্রভাত হ'তে

খাঁটি বিধিমতে

ছুটি নাই তাতে একটি বার,

করে প্রহরী ছয় জনা

ভীষণ তাড়না

দণ্ডে দণ্ডে দিনে সাতবার।

হ'লাম কারাবন্দী করলাম যেমন পাপ

তার উপরে কেন এত মনস্তাপ,

তাদের এ কি গো প্রতাপ
ত্রিতাপ সন্তাপ
জ্বলে প্রাণ বিষাদে।
মাগো, আমি বটি দোষী—
মেয়াদ খালাসী—
বারে বারে আসি কারাগার,
এবার পাঁচ হাকিমে বসে
কামাল এজলাসে
কর যদি একটি সুবিচার,—
বিশে ক্ষেপা এই নিবেদন করে—
জনমের মত দ্বীপান্তর করে
পাঠাবে আমারে সেই ভব পারে
অনুমতি ক'রে দে।

এই গানটি শ্রীশ্রীবাবার মুখ হইতে লিখিয়া লইবার সময় আমি এই ভাবের আর একটি বিখ্যাত গানের ("তারা, কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল" এই গানটির) উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ওটি তাঁহার এই গানের পরে রচিত।

(৩২)

আজ কাল করে মাগো গেল দিন,
গেল না কুদিন হ'ল না সুদিন,
তুমি দীন দয়াময়ী হ'য়ে এ দীনে দিলে না দিন।

জননী জঠরে ছিলাম
কঠোরেতে যত দিন,
ভাবতাম ভবে গিয়ে
ভজব তোমায় প্রতিদিন,
মায়ায় মন প্রবিষ্ট হ'ল
ভূমিষ্ঠ হলাম যেদিন ;
অম্‌নি সে সব ভু'লে বাল্যকালে
অজ্ঞানে কাটালাম দিন।
পৌগণ্ডে প্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যাশিক্ষায় দিন দিন
পাঠাভ্যাসে মনাবেশে
কাটা'লাম মা নিশিদিন,
কৈশোরে কেতনশরে
থাকিলাম প্রমদাধীন*
হ'ল এইরূপ দিন নিকট তারা
নিকট হ'ল দুর্দ্দিন।
বিশের মন দেখ ভেবে
র'বি ভবে আর ক' দিন,
সেদিনের আর ক'দিন বাকি
আছে য'টা গোণা দিন।

(৩৩)

আমি কি আপন বশে সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম করি ?
তা'হলে অমৃত ত্যজে বিষ কি খাইতাম হরি ?

* এই উক্তিও বাবার নিজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে।

যেমন নর্ত্তকী পুত্তলীগণে
নৃত্য করে তাল মানে
নিরখি দর্শকগণে বলে,—'বলিহারি'।
নাচিছে সে কার গুণে
দর্শক তাহা না জানে,
দেখিতেছে নটগণে ভ্রমিতেছে নৃত্য করি';
তেমনি তুমি নট-স্বামী,
নট-পুত্তলিকা আমি,
তার বশে সদা ভ্রমি ফেরাও তাই ফিরি।
নাচাও বেঁধে মায়া-তারে
কভু বাহ্য অভ্যন্তরে,
আসি যাই বারে বারে,
যা' করাও তাই করি, হরি।
হরি, আমি যদি আমি হ'তাম,
সুপথে সদা থাকিতাম,
তবে কি দুর্ণাম নিতাম বিশে ক্ষেপা নাম ধরি?

(৩৪)

মা ক্ষেপী যার পিতা ক্ষেপা
ও মন, তার কি দুখের সীমা আছে?
আমার যত দুখের কথা
শোনে কে বলি কার কাছে?
পিতা আমার পাগল ভোলা,
তার কাছে দুখ মিছে বলা,

তার পুঁজি তো ছাই সিদ্ধির ঝোলা
হাড়ের মালা সার করেছে।
মা নয় রে সামান্য ক্ষেপী,
চেনা ভার তায় বহুরূপী ;
মা কভু পিতার বক্ষে চাপি
নেংটা হয়ে রণে নাচে।
মা আমার কখনো রাজরাজেশ্বরী,
কখনো ভিখারিণী নারী,
ভোজের ভেল্‌কী জানে ভারি
তার ভেল্‌কীতে ভুবন ভুলেছে।
যা হয় হবে নিদান কালে,
গিয়ে সেই বিমাতার জলে,
ডাক্‌ব মাকে "মা মা" ব'লে
বিশে ক্ষেপা এই সার করেছে।

(৩৫)

মন বেদে নবীন সাঁপ
ধর্‌তে পারবে না।
ও তার গালীর দাঁতে তোমার যম নালীতে
কামড়ালে আর বাঁচবে না।
এ ত নয় রে মেটেলি ঢোঁড়া
চৌসাপা আর ঘোল চিতা
আছে নয় বোড়া,

এ সাপ ধর্‌ব বল্‌লে যায় না ধরা
ফাঁকা ধূলো পড়া মানবে না।
এ সাপ ধরা কথার কথা নয়,
অনেক মণিমন্ত্র আদি তন্ত্র
চেতন কর্‌তে হয়।
আপ্ত সাড়া না জেনে
অসাবধানে
সেখানে যাওয়া তোমার চল্‌বে না।
কয় দ্বিজ এ বিশের মন,
যোগে জেগে পাও যদি সে অমূল্য ধন,
তার মাণিক পাবে চলে যাবে
ভবে আস্‌তে তোমায় হবে না।

(৩৬)

এক পথে বেশ এলাম একা
এসে পাঁচ জনার কাছে পেঁচ লেগেছে
পাঁচ পথ দেখে লাগছে ধোঁকা।
পাঁচ পথের এমনি মজা,
কিছুই তার যায় না বোঝা
কেউ বলে এই পথ সোজা
কেউ বলে বাঁকা ;
আমি এমনি ক'রে বারে বারে
ভবে আসছি ফিরে হ'য়ে বোকা।

যাবার পথ দিয়ে ব'লে
যে ভাবে পাঠিয়ে দিলে
আমি তাই গেলাম ভু'লে,
এসে হলাম ভেঁকা।
দেখা পেলে পরে শুধাই তারে,
কিন্তু তার সঙ্গে আর হয় না দেখা
কয় দ্বিজ এ বিশের মন,—
পাঁচ পথে নাই প্রয়োজন,
মন, যাতে যাও সে পথে
ক'রো না কুমন ;
আছে এক পথেই পাঁচ পথের মিলন,
দেখ পাঁচে পাঁচে পঁচিশের লেখা।

(৩৭)

মন রে, এই ভবের বাজার বড় মজার
বেচা কেনা সার হতেছে ;
যার আগে মাল ফুরালো চলে গেল
কেউ ত এখন ব'সে আছে।
যত সব মহাজনে জহর এনে
দেখাচ্ছে জহুরীর কাছে,
কেউ তারে যতন ক'রে খরিদ করে—
জহর চিন্‌তে যে পেরেছে।
লাভে কেউ হচ্ছে রাজা—দেখ্‌তেছি যা—
ভূতের বেগার কেউ বইতেছে,

কেউ হারায়ে লাভে মূলে ধোঁকায় ভুলে,
　　দুনো ব্যাপার কেউ কর্‌তেছে—
মন আমার এ বাজারে বে-হুঁসারে
　　থাক্‌লে পরে বিপদ আছে,
ছ'জনা জুয়াচোরে ফেল্‌বে ফেরে,
　　ফির্‌ছে তার কাছে কাছে।
যদি মন লেনা দেনা বেচা কেনা
　　কর্‌তে তোর বাসনা আছে,
কয় ক্ষেপা এ বিশের মন, দর জান মন,
　　গিয়ে সেই বিবেকের কাছে।

(৩৮)

মূলতান—একতালা *

মন অলি বলি শোন
সেই কমল-মধু খেতে থাকে যদি মন,
থেকো না থেকো না কলুষ-কাননে
ব'সো না কামিনী-কেতকী-কুসুমে,
মধু নাহি পাবে রজস লাগিবে,
　　অন্ধ হবে দু নয়ন।
চল পৃথু-সরোবরে উদক উপরে—
　　তিন পদ্ম আছে যেখানে,
ও তার এক পদ্ম কোঁড়া পদ্মে পদ্মে জোড়া,
　　অধ ঊর্দ্ধমুখে সেখানে।

---

* সুর তাল দুইই বাবা বলিয়াছেন।

কমল ব'লে তুমি ভয় না করিবে,
ভরসা ক'রে তায় হুল বসাইবে,
ক্ষুধা মত সুধা খেতে পাবে,
সদা জুড়াবে জীবন।
(ও মন) সেথা হতে আসি পদ্মে পদ্মে বসি
ছয় পদ্মে কর মধুপান,
তবেই ভব ক্ষুধা যাবে গুন্ গুন্ রবে
সদা কর নাম গুণ গান।
(ও মন) মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরে
গুরুদত্ত অর্থ দেখ তত্ত্ব ক'রে,—
আছে কোন্ ঘরে, পাবে কি প্রকারে,
কর তারই অন্বেষণ।
সে ধন যেখানে নিশি নাই সেখানে,
চন্দ্র সূর্য্য তারার নাই উদয়,
কেবল রত্নবেদী মাঝে অটল বিরাজে,
অধরা তায় ধরা সহজ নয়;
গুরু আজ্ঞা মতে বিশে ক্ষেপা বলে—
যেতে যদি পার দ্বিদল-কমলে,
সেথা গেলে পরে যাবে সহস্রারে,
প্রাপ্ত হবে তুমি গুপ্ত ধন।

(৩৯)

বাগেশ্রী

এ কার মেয়ে দশভুজা,
গিরি হে গৃহে আনিলে ?

কই সে আমার উমা
যারে আনিতে গিয়েছিলে ?
দ্বিভুজা আমার গৌরী,
এ যে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী,
উমা হলে 'মা মা' বলে
আস্‌ত কোলে,
অসুর নাশিছে এ যে
রণমত্ত এলোচুলে।
দুই পাশে দুই কন্যা,
অনুমানি নয় সামান্যা,
উভয়েরই রূপ লাবণ্যে
ভুবন ভোলে,
শশী মসী হ'য়ে যায় যার নখ হেরিলে।
দক্ষিণেতে গজানন,
বামেতে শিখিবাহন,
শিরোদেশে পঞ্চানন
বো বোম্ বোম্ বলে।
বিশে ক্ষেপা বলে, রাণি,
চিন না কন্যা ঈশানী,
জগজ্জননী তোমায় জননী বলে,
ব্রহ্ম যাঁরে ব্রহ্ম ভেবে
পূজেন দিয়ে বিল্বদলে।

(৪০)

আমার সাধ মিটেছে, গো শ্যামা,
যা ছিল সব আশা করিলি নিরাশা,
আশা-বাসা-নাশা হর মনোরমা।
মা, তোর পদে রাখ্‌লে মতি ঘটে পরমাদ,
ওরূপ চিন্তনে চির অবসাদ,
তুমি সাধে সাধ বাদ
বিষয়ে বিষাদ
জানি গো পাষাণি, তোমারি করুণা।
(ওমা) সাধ ক'রে আমি পাতলেম সাধের হাট,
ঘটা দেখে বুঝি ঘটালি ঝঞ্ঝাট,
দিয়ে ছ' জন নাট সব করালি লোপাট,
পুঁজি পাটা কিছুই রাখলি নে মা।
গেল ধন মান আত্মীয় স্বজন,
রাখ্‌লি নে মা কিছুই বলিতে আপন,
আর "আমা"তে কাজ নাই,
"আমি"ই ত বালাই,
"আমি আমি" ক'রে দুখের নাই মা সীমা।
দুখ দিসি দীনে দুখহরা হ'য়ে
সে সব দুর্গতি র'ব সব সহিয়ে,
যার মা বিনে কেউ নাই
সেই মা যদি কাঁদায়
কে আর করে তারে সান্ত্বনা?

কাঁদাবি কাঁদিব "কালী কালী" ব'লে।
শ্রীচরণ ধোয়াব নয়ন সলিলে,
(ওমা) দিব গড়াগড়ি পদে কুতূহলে,
এই কান্না কাঁদিতে কালীর কামনা ।।

এই অপূর্ব্ব গানটি শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার অতি পুরাতন শিষ্য ৺কালী ঘটক মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহারই নামের ভণিতা দিয়া রচনা করিয়াছিলেন।

এই গীতাবলীর ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে শ্রীশ্রীবাবা যখন এইগুলি একটি একটি করিয়া আমাকে দেন তখন ৺দুর্গাকান্ত রায় দাদা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রকাশিত "গীত রত্নাবলী" (প্রথম ভাগ) গ্রন্থস্থ কতকগুলি গানও আমাকে বলেন। ঐগুলি আমি পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিলাম। তখন দেখা গিয়াছিল কতকগুলির রচনা-বৎসর ঐ পুস্তকে ভুল ছাপা হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবার মুখ হইতে ঐগুলির রচনা বৎসর আমি যেমন পাইয়াছিলাম তাহা নিম্নে দিলাম (গানের নম্বরগুলি গীত-রত্নাবলীর)।

১নং গান—"দুর্গে সহিতে পারি না আর" ইত্যাদি

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৭।

২নং—"বারে বারে কতবার ভবে যাওয়া আসা করি"

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৬।

৩নং—"ওহে গদাধর গোকুলেশ্বর, কেন সৃজিলে এ ধরা"

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৭।

৪নং—"কেন মা তুই গেলি ভুলে"

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৭।

৫নং—"বড় দুঃখ হল মা তোর ব্যবহারে"

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৬।

৬নং—"ফেলিস্ না মা কোল থেকে আর"

রচনা-বৎসর ১২৭১ নয়, ১২৭৮।

৭নং—"সুখে থাক্‌বে যদি মন সংসার মায়ায় ম'জ না"

রচনা-বৎসর ১২৭২ নয়, ১২৭৮।

১২নং—"দুর্গা আর গতিক ভাল নয়"

১৩নং—"হরি কতদিনের আশা ছেড়ে সব আশা"

১৫নং—"কি করে বুঝিব মা তোমায়"

১৬নং—"দুর্গে সবই যে মা গেল দেখি"

১৭নং—"শাস্ত্রে করে সন্দ লাগাইছ দ্বন্দ্ব"

১৮নং—"বলিব কি আর কথা সবই দেখি বৃথা"

১৯নং—"মা ভক্তে আমি কি করিতে পারি"

২০ন—"তারা সেদিন আমার কবে হবে"

এই গানগুলির কোনওটিরই রচনা বৎসর ১২৭১ নয়, সকলই ১২৭৭ সনে রচিত।

২১নং—"একবার উঠ মা জেগে শিবে আর কত ঘুমাবে"

২২নং—"মন তুমি কত সাজ সেজে এসে ভব মাঝে"

২৩নং—"পোহাও না আর যামিনী"

এই তিনটি গানের রচনা বৎসর ১২৭৫, নয় ১২৭৮।

২৪নং—"হায় রে আমার কিছু হ'ল না"

২৬নং—"সদা প্রাণ ভরে কর দুর্গা নাম"

২৭নং—"মা, আমি তোর কাছে কি এত অপরাধী"

এইগুলির রচনা বৎসরও ১২৭৫ নয়, ১২৭৯।

বুদ্ধ ও রাধা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে প্রেম বাহিরে তোমা ভুলাইয়া আনে,
সে প্রেম কেন যে তারে কিসের আহ্বানে
অন্তর্লীন ক'রে রাখে অন্তঃপুর মাঝে,
নব বধূটির প্রায় সলজ্জিত সাজে
গোপন হৃদয়-তলে! পথের নেশায়
স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আপনি বিলায়
শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রেম তব; নিঃস্ব করি' নিজে
এমন অপার তৃপ্তি কিসে পাও কি যে!
তার সে একক-নিষ্ঠা তোমার বহু রে
ছাড়াইয়া চলে যায় একান্ত সুদূরে—
যেখানে দিনের আলো, বর্ণচ্ছটা নাই,
ত্রি-ভুবন ঢাকা নিত্য গাঢ় নীলিমায়
নবঘন শ্যামরূপে। তাহার অন্তরে
বিচিত্র জগৎখানি আনাগোনা করে!

শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের বিবরণ

আমার বয়স তখন তের চৌদ্দ বৎসর, সিহাড়শোল স্কুলে পড়ি। স্কুল ছুটির সময় হঠাৎ আমি আমাদের কুল-গুরুর দর্শন পাইলাম। আমাদের বাড়ীতে প্রায় প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পরই তিনি আসিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইও কখন কখন আসিতেন। কিন্তু বড় ঠাকুরের প্রতিই আমার ভক্তি হইত, সেজন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম, "আমাকে শিষ্য করিয়া লউন। অন্য ঠাকুরদের কাছে দীক্ষা লইব না, তাঁহারা লোভী। আপনিই দিন।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার পিতা আসিলে তাঁকে বলিব, তুমিও বলিবে।" সন্ধ্যায় পিতৃদেব শুনিয়া রাজী হইলেন, কিন্তু পিতৃদেবের পিতৃব্য উল্টো আমাকে ধমক দিলেন। কিন্তু গুরুদেব প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "মুনীন্দ্র যখন চেয়েছে তখন দিব নিশ্চয়, তোমাদের মত হউক বা না হউক।" সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকা আনিয়া পরের দিনই মন্ত্র দিতে স্থির করিলেন এবং আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মন্ত্র গ্রহণ করা হইল।

সেইদিন হইতে তাঁহার আদেশ মত স্নান করিয়া ঠিক সংখ্যা মত জপ করিয়া পরে খাইতাম। এইভাবে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ

করিলাম। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ডাক্তারী পাঠও শেষ করিলাম। বছর দেড় চাকরীও করিলাম। সেই সময়ে ঠিক নিয়ম মত না করিলেও কর্ম ছাড়ি নাই। অধঃপতনের রাস্তায় পড়িয়াও সময় সময় স্মরণ হইত। কলিয়ারীর চাকরী ও বন্ধুদের সঙ্গে বাস, ইহাতেই বেশ বিপথে গতি হইল। প্রথম চাকরী চারি মাস, দ্বিতীয়টি দুই বৎসর, তৃতীয়টিও দুই বৎসর। এই চাকরীতে আমি বড় বাবুদের ও ছোকরা বাবুদের উভয় দলেই মিশিতাম। তবে বেশীর ভাগ বড়বাবু ডাকিয়া টানিয়া নিজেদের দলে ভিড়াইতেন,—তাস খেলা, গান-বাজনা ইত্যাদি নানা প্রকারে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটিত। ছোকরাদের দলেও ঢুকিয়া অনাচার, স্বেচ্ছাচারাদি চরিত্রগত অধঃপতনের কার্য্যে যোগ দিতাম।

একদিন সন্ধ্যায় গান-বাজনা না করিয়া ঠিকাদার বরদাবাবু ও বড়বাবু রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ইনি পরে গুরুভাই হন) সদ্‌গুরু লাভের প্রসঙ্গ উঠাইলেন। আমি মাত্র শ্রোতা, কোন কথা বলিবার মতন জ্ঞান আমার নাই। সেই প্রসঙ্গে তিনি কাশীর লাহিড়ীবাবুর শিষ্য বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের, তান্ত্রিক বাবা কৈলাসপতির এবং বর্দ্ধমানের গন্ধ-বাবার নাম উল্লেখ করিয়া নানা বিচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই তিন সপ্তাহ গান-বাজনা, খেলা, গুরু-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল, অবশ্য সব দিন নয়। বড়বাবুর বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নাই। মেসে আহারের পর তিনি আমাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "এস, তামাক খাওয়া যাক্?" তামাক খাইবার সময় বিছানায় একটি লাল পাটা-বাঁধান বই আমার নজরে পড়িল। তুলিয়া দেখি উহা "ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা"—

আর্য্য মিশন হইতে প্রকাশিত। রাজেন দাদা বলিলেন, "পড়বে? পড়গে যাও।" বইটি লইয়া বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। বইখানির শেষের দিকে দেখি একটি বড় গল্প। সময় মত পড়িতে পড়িতে শেষ করিয়া আবার আরম্ভ করিয়া একটানা শেষ করিলাম। গল্পটি রাজা, রাজগুরু ও রাজগুরুর পাগল পুত্র লইয়া। রাজার শান্তির অভাব, রাজগুরু শান্তি দিতে পারলেন না, পাগল ছেলে পথ দেখাইবার হেতু হইলেন। এখন বুঝিয়াছি সে গল্পটি বোধ হয় যোগবাশিষ্ঠের একটি গল্প। এই গল্পটিই আমার অন্তরে আলোড়ন আরম্ভ করিল। নিজে প্রত্যহ বড়বাবুদের দলে যোগ দিতাম। সদ্‌গুরুর সন্ধানে বরদাবাবুকে কলিয়ারী হইতে বড়বাবু দ্বারা ছুটি মঞ্জুর করাইয়া (তাঁহার বাড়ী বিষ্ণুপুর সন্নিকটে এবং তিনি পূজনীয় কৈলাসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানেন) বাড়ী পাঠাইলাম। কয়েকদিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ মত পূজ্যপাদ লাহিড়ী বাবার পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়কে ৺কাশীধামের ঠিকানায় পত্র দিলেন। উত্তর আসিল, "সময় সাপেক্ষ।"

পুনরায় তাঁহাকে পত্র দিলেন। তাহাতেও ঐ প্রকার উত্তর আসিল। তখন সকলেই একমত হইয়া কৈলাসপতি বাবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি তখন ভাবিলাম, 'বেশ হবে, মদ্যপানে বাধা থাকিবে না অথচ সাধনাও হইবে।' এইভাবে দুই পাঁচ দিন না যাইতেই কলিয়ারীর নিকট মোনপুরা গ্রামে ডাকাতি হইল। সেখানে ডাকাতরা কৃতকার্য্য না হইয়া গোয়ালে আগুন

লাগাইয়া পলাইয়া যায়। এই ডাকাতি তদারক জন্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইন্সপেক্টার রামকা-নালীতে ট্রলী লইয়া কুঠীতে আসিলেন ও আমার বাসায় নিজের বিছানা রাখিয়া আমাদের গান বাজনা আসরে গুদামবাবুর বাসায় চৌকীদার কনেষ্টবলসহ হুঁকা হাতে উপস্থিত হইলেন। পুলিশ অনুমান করিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করে এবং তিনি রঘুনাথ থানার ইন্সপেক্টার জানিয়া তাঁহাকে যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করে। গান হইতেছিল, "কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া।" গান বন্ধ হইয়া গেল। চা-তামাকের পর উপেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "গান ভাল লাগে কেন?" আমি উত্তর করিলাম, "কেন আপনিই বলুন। ঐ গোমস্তাবাবু গান আরম্ভমাত্রে শুয়েছেন দেখুন, আর জোরে কিস্তি বলিলেই উঠিবেন এবং বলিবেন 'থাম্ থাম্ দেখি, তারপর কিস্তি দিবি', কিম্বা নাক ডাকিতেছে, তামাকের গন্ধে বলিবেন 'দিস্ একবার খাই।' এরূপ কেন হয় বলুন ত?"

পূজনীয় উপেনবাবু আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভায়া, তোমার বাড়ীতে আমার বিছানাদি বৌমাকে দিয়াছি, তুমি যে ঘরটিতে থাক সেই ঘরটিতে আমার বিছানা হইবে। তোমরা পাশের ঘরে থাকিবে।" বলিয়াই, স্বভাব, স্বজাতি, বিধর্ম্ম, বিজাতি চারিটি ভাগ উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন এবং সেই লেকচারের মধ্যে আমরা যে কয়জন ছিলাম, প্রত্যেকের যে উপায়ে যে সময়ে অসৎ সংসর্গ ঘটিয়াছে সব বলিলেন। এমন কি, অসৎ ব্যক্তির নামগুলি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন, প্রত্যেকেরই অন্তর কাঁপিয়া উঠিল এবং আমরা নীরব হইয়া

গেলাম। তবুও আমি 'ভায়া'—সম্বোধন, আমার বাসায় অবস্থান হবে, আমার স্ত্রীকে 'বৌমা' ব'লে বিছানা রেখে এসেছেন, এই সব চিন্তা করিয়া মনে একটু সাহস পাইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ইহার কি প্রতিকার নাই ?" উত্তরে বলিলেন, "সে কি ভায়া, মহাদেব আগে ঔষধাদি সৃষ্টি করেছেন, পরে রোগ সৃষ্টি।"

এমন সময় মেসের ব্রাহ্মণ ঠাকুর "আহার্য্য প্রস্তুত" বলিয়া ডাক দিলেন। সকলেই উঠিয়া মেসের বাসায় গেলেন। আমি বাড়ী গিয়া দেখি—ঠিক উপেন দাদার আদেশ মত বিছানাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। আহারাদি সারিয়া তাঁহাকে লইয়া ঘরের নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে গেলাম। খাটে বসিয়া ঐ সব কথাই চলিতেছে, হঠাৎ একটা সুগন্ধ ঘরের ভিতর দিয়া অন্তরে নাড়া দিল। "কিসের গন্ধ কোথা হইতে আসিল ?" উপেন দাদা বলিলেন, "এমন হয়, সে সব পরে বুঝবে।"

শোনা ছিল গন্ধ-বাবার বহু পুলিশ শিষ্য আছে। ইনি হয়ত তাঁরই শিষ্য—তাই গন্ধ পাওয়া গেল। রাজেন দাদা (বড়বাবু) জানিতেন, গন্ধ-বাবার প্রথম গৃহী শিষ্য উপেনবাবু সব ইন্সপেক্টর, তবে তাঁকে চিনিতেন না। কথা-প্রসঙ্গে সকলের ভিতরই চমক্ লাগিয়াছে। রাত্রের লেকচারে সকলেই বুঝিল, ইনি সব জানিতে পারেন। সকালে ৮টার পূর্ব্বে আমার বাসার দরজায় লোকের ভিড় হইল। আহ্নিক হইতে উঠিয়া চা খাওয়ার পর (চৌরাসী কলিয়ারীতে আমার ঘোড়া ছিল) উপেন দা ঘোড়া চাহিলেন। বলিলাম, "তৈয়ার, মনপুরা যাবেন। এবেলা আমি বেরোব না।" বলিলেন, "সহিস সঙ্গে দাও, ঘোড়া ফিরাইয়া আনিবে।" আমি

রাম কা-নালীর Sub P. W. I. নরেন বাবুকে trolley আনিতে বলিয়াছিলাম। ঘরের বাহির হইবা মাত্র যাহাকে যাহাকে দেখিলেন সকলকেই টাটকা ফলিবে এমন দুই একটি কথা বলিয়া ঘোড়ায় উঠিয়াই আমাকে বলিলেন, "ভায়া, সাবধানে থাকিবে, পায়ে চোট লাগিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিনে?" উত্তর—"তাহা বলিব না।"

কয়েকদিন পরে সত্যই আমার পায়ে চোট লাগিল। পড়িয়া যাই, বিশেষ কারণে ঘোড়াটাকে নৌকায় তুলিবার কালে। পায়ে জুতা ছিল। জুতার (ডান পায়ের) উপর ঘোড়ার পা পড়িয়া ফিতা ছিঁড়িয়া যায়। আঘাত কম বা বেশী কিছু বুঝিলাম না। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘোড়া হইতে নামিবার কালে দেখি জোর দিতে পারি না। জুতা খুলিয়া ফেলিবার পর দেখিলাম পা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। আধঘণ্টা পরেই উপেন দাদা দ্বিতীয়বার enquiry করিতে আসিলেন এবং বলিলেন, "তার্পিণ লাগাইলেই ভাল হইয়া যাইবে।" তার্পিণ ছিল, সত্যই উহা লাগাইবার একটু পরে ফুলা প্রায় কমিয়া গেল। অল্পে অল্পে পা ফেলিতে পারিলাম। পরে বেদনা থাকিলেও হাঁটা বন্ধ হয় নাই। অন্যান্য সকলকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন—কাহারও অর্থাগমের সূচনা, কাহারও বাড়ীর আশঙ্কার সূচনা—তাহাদের সব ফলিতে দেখা গেল। কাজেই মনের আকর্ষণ শ্রীশ্রীগন্ধ-বাবার দিকে যাওয়া স্বাভাবিক।

এবারে উপেন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী সর্পী উখরার হেডমাষ্টারকে জান? তিনি আমার ভাই, তাঁর মেজোভাই দক্ষিণাপ্রসাদ ছোট ভাই জানিবে।" আমি

বলিলাম, "পূজনীয় রাধিকাবাবু আমার হেডমাষ্টার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পিতৃবন্ধু এবং প্রকৃতই আত্মীয়।" কে বুঝিবে যে তিনি পরমাত্মীয় ? তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, দোষ জন্য চাবুক দিতেন, আবার নিজেই কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁহাকে চিঠি লিখিলাম। তাহার উত্তর উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। উপেন দাদার কাছে রঘুনাথপুর যাইতাম। প্রতি সপ্তাহে আমাকে কাজে যাইতে হইত, ঐ সঙ্গে এক দৌড়ে তাঁহার সঙ্গেও বাসায় দেখা করিতাম আর আমাদের জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে জানাতে বলিতাম। একদিন উত্তর আসিল—"আষাঢ় মাসে হইতে পারে, যদি যাওয়া হয়—যদি যাওয়া না হয় পরে হইবে।" উত্তর-পত্রখানি দাদা পড়িয়া শুনাইলেন, নিরাশায় আশা পাইলাম এবং রাধিকাবাবুকেও জানাইলাম। এইভাবে পত্র ব্যবহারে আষাঢ় মাস পার হইয়া গেল। রাধিকাবাবুর পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় বাবা প্রতি বৎসর বণ্ডুল আশ্রমে নিজ জন্মভূমিতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত থাকেন। ঐস্থান বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে উত্তরে সাত আট ক্রোশ, গো-গাড়ী ভাড়া মিলে, রাস্তায় ভীষণ কাদা" ইত্যাদি। পরে লিখিয়াছেন—"চেষ্টা কর যাতে যাইতে পার। তোমার ভাগ্যে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় আছে।" সন ১৩১৯ সালে শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্রের প্রথমে এই পত্রখানা পাইয়া অর্থের যোগাড়ে থাকিলাম, কারণ আমার বাড়ীতে শ্রীশ্রীমাতার পূজা হইত—বাড়ীতে টাকা দিয়াও এ অতিরিক্ত খরচ চাই ত।

বর্ত্তমানে পরলোকগত অনাদিভূষণ রায় নামে আমার এক

। সে আমার গ্রামবাসী ও ছোট ভাইয়ের মতন— আমিই তাহাকে কলিয়ারীতে আনিয়াছিলাম। তাহাকেও বড়ড়াগড় কলিয়ারী ঝরিয়াতে পত্র দিয়া নিজ মনোভাব জানাইলাম। সে পত্র পাইয়া উত্তর দিল—"আমি দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছি, তখন সমস্ত শুনিব।" শ্রীশ্রী৺দুর্গা চতুর্থীর দিন অফিস হইতে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া কোকিল সহিসকে তামাক সাজিতে বলিয়া খাটে শুইয়া পড়িলাম এবং তামাক না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখি, আকাশে দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তার মধ্যে একজন মহাপুরুষ পদ্মাসনে বসিয়া কি যেন বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। এমন সময় ভোজনের ডাক পড়িল। খুব আনন্দ হইয়াছিল। পঞ্চমীর দিন বাড়ী পৌঁছিলাম। পিতৃদেবকে যাহা দিবার দিলাম এবং বলিলাম —"আমি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে দশমীর রাত্রিতে বর্দ্ধমান যাইব ইচ্ছা করিতেছি।" বাবা একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি যখন কাঁদিতেছেন তখন আমি যাইব না।" উত্তরে বাবা জোরে কাঁদিয়া বলিলেন, "না গো না, আমি কাঁদি নাই। আমি ভাবিতেছি আমাদের কি এমন ভাগ্য হবে যে মহাপুরুষ-চরণাশ্রয় পাব? এইজন্য চোখে জল আপনিই আসিতেছে। আমি আনন্দে অনুমতি দিতেছি তুমি যাইতে পার।"

সঙ্গীত-গুরু সীতারাম মিশ্র ও অনাদি বড়ড়াগড় হইতে এক সঙ্গে অণ্ডাল পৌঁছিয়াছেন। অনাদির সঙ্গে দেখা হইলেই সে

মিশ্রদাদাকে বলিল,—"বাবা ও কাকা উভয়ের ইচ্ছা তুমিও যাও।" মিশ্রদাদা বলিলেন—"দেখে এসো, পরে যাবো।" শ্রীশ্রীমাতার পূজা আনন্দেই কাটিল। বিজয়াদশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর গ্রামস্থ প্রায় সব গুরুজনদিগকে প্রণাম সারিয়া রাত্রি সাড়ে বারটা কি একটায় আমি ও অনাদি বাহির হইলাম। দেখিয়া সীতারাম মিশ্র দাদার মন খারাপ হইল—বাবাকে বলিলেন, "আমিও যাইব।" বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি চল, তোমার কাপড়-গামছা আমি লইয়া যাইতেছি। পেছু ডেকো না।" মা দুর্গা ও বড়-কালীকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াই দেখি সীতারাম দাদা বলিলেন—"আমিও যাব।" আমি "চলুন" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বেহারী মিস্ত্রি সূত্রধরকে অনাদির কাকা আমাদের সাহায্য করিতে সঙ্গে দিলেন।

আমরা ভোরের ট্রেণে অণ্ডাল ষ্টেশনে উঠিয়া বর্দ্ধমান পঁহুছিলাম এবং পূজনীয় হেডমাষ্টার রাধিকা বাবুর উপদেশ ও আদেশ মত ভাড়াটিয়া গো-গাড়ী দুই জোড়া ঠিক করিলাম। জল খাবারাদি খাইতে এবং গরু দুই জোড়ার খাবারাদির জন্য কিছু বিলম্ব হওয়াতে বারটার সময় গাড়ী ছাড়িল। মধ্যে শোণপুর গ্রামে ভীষণ কাদা—গাড়ীর চাকা ঢুকিয়া যাইতেছে। ঐ দুইজন এবং সময় সময় গ্রামের দুই একজন গরু হাঁকাইয়া কোন প্রকারে গ্রামটি পার হইতে সোয়া ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা লাগিল। গাড়োয়ান বলিল, —"আপনারা ঘুম দেন। কুড়মনের বাহিরে সরকারী রাস্তায় ঐরূপ কাদা। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে দেয় না। কিন্তু গ্রামের শেষ প্রান্তে যদি কেহ ধরে তখন রোগীর গাড়ী আলি

হাসান ডাক্তারের বাড়ী যাইতেছে বলিয়া অনুনয় করিলে ছাড়িয়া দিবে। এমতে এভাবে রাত্রি নয়টার সময় আশ্রমে পৌঁছিতে পারিবেন।" ঐ ভাবে ডাক্তার বাড়ী পার হওয়ার সময় একজন গাড়ীর সামনে আসিয়া "ফিরাও গাড়ী" বলায় আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবেন ?" আমি বলিলাম—"বগুলে পরমহংসদেবের কাছে।" "আচ্ছা, যান। এ রাস্তা দিয়া গ্রামের কেহ গাড়ী যাইতে দেয় না।" যাহা হউক, রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় গাড়ী কোচ কোচানি শব্দে আশ্রমে পৌঁছিল। একজন লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাকার গাড়ী ?"

দেখিলাম প্রায় ত্রিশজন শিষ্যসহ শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া আছেন—বড় হাত-পাখা চলিতেছে। দেখিবামাত্র মাথা আপনিই শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িল। আদেশ হল—"অন্নদা, তিনটি পাত্রে করিয়া জল দাও।" বেহারীকে বলিলেন—"এই রাস্তা পার হয়ে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে এসো।" বেহারী ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—"তুমি ত গাড়ীতে থাকিবে মনস্থ করিয়াছ ? খাবার নিয়ে যাও।" গাড়োয়ান দুইজনকেও যথেষ্ট পরিমাণে চিড়ে, বোন্দে ও মুড়ি দেওয়া হইল। আমরা মুখ ধুইয়া নিকটে বসিবামাত্র তিনি আমাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের দুইজনের ত দীক্ষা হইয়াছে, কিছু কিছু পরিশ্রমও করিয়াছ, কিন্তু আনন্দ পাও নাই। কুলগুরু যে মন্ত্র দিয়া আসিতেছেন তাহাই দিয়াছেন, এজন্য আস্থা হারাইতেছ। মন্ত্র বিচার করিয়া না দিলে এইরূপই হয়।" শিবুদাদার পিতা ইন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীবাবার খুড়তুতো ভাই এবং মন্ত্রশিষ্য, তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাত নাই? ইহারা লুচি মিষ্টিতে নারাজ।" ইন্দ্রকাকা বলিলেন—"ভাত নাই।" "তবে মুড়ি ও দুধ দাও, সামান্য বোন্দেও দিও।" আমাদের খাওয়া শেষ হইতে না হইতে "অন্নদা, পান দিও" বলিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। আমাদের কোন কথাই বলা হইল না। মশা এবং চিন্তার জন্য প্রথম রাত্রে ঘুম হইল না। রাত্রি একটার পর ঘুমাইয়া পড়ি। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি যে সব শিষ্যই উঠিয়া গিয়াছেন। তিনজনেই কাপড় গামছা লইয়া শৌচাদি ও স্নানাদি সারিয়া আসিয়া প্রার্থনা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া যেমন দরজায় উপস্থিত হইলাম অমনি দেখি বাবা নামিয়া আসিয়া বসিলেন। প্রণাম করিয়া নিকটে বসিয়া আমিই বলিলাম, "বাবা, আমাদের কি হইবে?" উত্তর—"হ্যাঁ গো, কাল সাতটার পর হবে। ভিতর থেকে পঞ্জিকাটি আন দেখি।" পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন,—"সাড়ে সাতটার পর।" "ইন্দ্রনাথ, এদের দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিও", কাকাঠাকুরকে আদেশ করিলেন। আমাকে ও সীতারাম দাদাকে বলিলেন, "তোমাদের তিন জন্মের মন্ত্র বিচার করিয়া উপযুক্ত বীজ নির্ণয় করিয়া দিব—যাও, তোমরা মুখ হাত ধুইয়া স্নান সারিয়া এসো। রাধিকাকে চেন?" আমি পকেট হইতে সব চিঠিগুলি বাবার হাতে দিলাম। সবগুলিই পড়িলেন এবং বলিলেন,—"রাধিকাকে বলো, তাহাই হবে।" স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিলাম ও প্রসাদ দ্বারা জলযোগ করিলাম। পরে কাকাঠাকুর গুরুভাই জ্ঞান মণ্ডলের দোকান হইতে কাপড়, বাটি, ঘৃত (আসন পাইলাম না)

খরিদ করিয়া দিলেন। বাবার শিষ্য ইঞ্জিনিয়ার কুঞ্জবিহারী ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্ব হইতে আসা যাওয়া প্রার্থনা ছিল কি?" বলিলাম,—"না।" "বাঃ, বেশ ভাগ্য ত। বলবা মাত্র অনুমতি পেলেন। কেউ দুই তিন বৎসর ধরিয়া ফিরিতেছে, অনুমতি হইতেছে না।" আহারের পর বাবা নীচে বিশ্রাম করিতেছিলেন। যে মাছিটি গায়ে বসিতেছে সঙ্গে সঙ্গে পা পুড়িয়া উল্টাইয়া পড়িতেছে। গন্ধে ঘর ভরপুর। অতি অপূর্ব্ব মধুর গন্ধ। কিসের গন্ধ বুঝিতেই পারি না। তবে বাবার গাত্র-গন্ধ তাহা বুঝিতেছি। বিকালেও নিকটে বসিয়া বহু উপদেশ কথা শুনিলাম। রাত্রি ঠিক নয়টায় উঠিয়া গেলেন। কুঞ্জবাবু বলিলেন, "কাল কেবল আপনাদের জন্যই সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত নীচে ছিলেন।"

পরদিন—এই দিন সন ১৩১৯ সাল আশ্বিন শ্রীশ্রীদুর্গা ত্রয়োদশী—আমাদের জীবনের চিরস্মরণীয় দিবস। প্রাতে উঠিয়া শৌচ ও স্নান সারিয়া যে কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম সেই কাপড়ই পরিয়া তিনজনেই শ্রীশ্রী৺বণ্ডুলেশ্বর শিবের বারান্দায় কাকাঠাকুরের আদেশ মত বসিয়া থাকিলাম। শ্রীশ্রীবাবা শিব ঘরের ভিতরে ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে অনাদি ভায়াকে ডাকিলেন। সে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। আমরা সব শুনিতে পাইতেছি, যদিও কপাট বন্ধ। প্রথমেই বাবা বলিলেন—"তোমাদের ঐ উঁচু ঘরটি নয়?" "হাঁ বাবা।" তারপর বলিলেন—"যেতে রাস্তার ডান দিকে ভাঙ্গা ঘরটি দুর্গাবাড়ী—তোমাদেরই ত?" "হাঁ বাবা।" তৃতীয় প্রশ্ন— "তোমাদের বাড়ী যাইতে ভাঙ্গা বিষ্ণু-মন্দির দালান পড়ে?" "হাঁ বাবা, ঐটি সুদর্শনদেবের, উহা আমাদেরই।" চতুর্থ প্রশ্ন—

"তোমাদের গুরু অমুক গোস্বামী—তিনি ত পরলোকগত হইয়াছেন কয়েকদিন পূর্ব্বে ?" "অসুখের কথা জানি, দেহরক্ষার কথা শুনি নাই।" বাবা বলিলেন—"দেহরক্ষা করিয়াছেন।" এই বলিয়া তাহাকে পূজাদি করাইয়া ক্রিয়াদি সব দেখাইয়া দিলেন এবং পুনরায় তাহাকে সমস্ত উপদেশ আদেশ ঠিক বুঝিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইয়া, নূতন আসনের ব্যবস্থা করিতে ও যোগদণ্ড করাইয়া লইতে বলিলেন। পরে কপালে ও মাথার উপর চন্দনের টিকা দিয়া যাইতে বলিলেন। তারপর সীতারাম দাদাকে ডাক পড়িল। তাঁহাকে বলিলেন, "উপাস্যদেবতা ঠিক হইয়াছে। কুলগুরু তোমাকে এই সাধারণ বীজ দিয়াছেন।" এই বলিয়া তাহার প্রাপ্ত মন্ত্রটি সম্যক্ বলিতেই দাদা বলিলেন—"হাঁ বাবা, ঠিক ঐ।" "দুইটি বীজ ঠিক দেওয়া হয় নাই।" "যা দিতে হয় দেন।" তখন আরও দুইটি বীজ যোগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে পূজাদি সব করাইলেন এবং পরে পূর্ব্ববৎ অভিষেক বা টিকা দিলেন। তিনি বাহিরে আসিলেন এবং আমার পালা পড়িল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কবাট দিলাম ও প্রণাম করিয়া বসিলাম। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—"অমুক তোমাদের কুলগুরু। তাঁহার নিকট হইতে তুমি এই মন্ত্র পাইয়াছ। তোমার গত জন্মে এই মন্ত্র, তৎপূর্ব্ব জন্মে এই, এ জন্মে তোমার এই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি এই (বীজসহ সম্যক্) মন্ত্রটি পাইয়াছ এবং তুমি তার উপদেশ মত বেশ কিছু চেষ্টা করিয়াছিলে। বিচারে তোমার এই হওয়া উচিত।" "হাঁ বাবা, আমার যাহা উপযুক্ত বুঝেন দেন।" তারপর পূজাদি ও ক্রিয়াদির উপদেশ পূর্ব্ববৎ সব

বলিয়া দিলেন এবং শেষে কপালে চন্দনের টিকা ও ব্রহ্মতালুতে টিকা দিলেন। সে স্পর্শ কি অনির্ব্বচনীয়, যেন আমার সর্ব্ব শরীরে অদ্ভুত আনন্দের শিহরণ উঠিল এবং মনে হইল তিনি আমার সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিলেন এবং পাপ-তাপ দূর করিলেন। প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম—"আমি যে অধঃপতনের রাস্তায় পড়িয়াছিলাম তাহা হইতে যেন দূরে থাকিতে পারি বা প্রলোভন এড়াইবার ক্ষমতা জন্মে।" আজ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকৃপায় আমার বল অক্ষুণ্ণ আছে, আমার সে প্রার্থনা তিনি পূরণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমার একখানি গান দিলাম—

মালকোশ

স্বরগের ঠাকুর　　ওহে যোগিবর,
গুরুবররূপে দিলে হে দেখা,
তোমার ব্রহ্মণ্যজ্যোতি　　দীপ্ত সর্ব্ব অঙ্গে,
মুখখানি সদা হাসিমাখা।
কিবা বিশাল লোচন দেখে ভয় পায়
(অথচ) স্নেহ করুণামাখা ;
হেরে আপনি জ্বলিয়া উঠে জ্ঞানের প্রদীপ
সরায়ে অজ্ঞান তিমির ঢাকা।
অতি অপূর্ব্ব অঙ্গের সৌরভ
কিবা অদ্ভূত কৌশল ঢাকা,
যার নাসায় পশেছে সে চরণে লুটেছে ;
তাহারে ধরিয়া না যায় রাখা।

কিবা সুমধুর নাম শ্রীবিশুদ্ধানন্দ,
শুনে মনে স্ফুরে বিশুদ্ধ আনন্দ,
সূরজ-বিজ্ঞানে সৃষ্টির কৌশল
তোমার কৃপায় মোদের দেখা।
কিবা চরণ-কমল কোমল শীতল
রোগ-শোক-তাপ-নাশা,
যে পেয়েছে স্থান করে তুচ্ছ জ্ঞান
যুগ যুগান্তর স্বরগে থাকা।
চাই না হে কিছু, সব দিয়াছ দিতেছ,
চাই শ্রীচরণে মতি অচল রাখা,
যেন অন্তিম সময়ে মনে প্রাণে মোর
জয় গুরু শ্রীগুরু হয় হে ডাকা,
আর তুমিও দয়া করে অধম পাগলে
ঐ শ্রীরূপেতে দিও হে দেখা।

সীতারাম মিশ্র দাদারও একই দিনে আমার পূর্ব্বে দীক্ষাপ্রাপ্তি হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার রচিত একখানা গানও প্রাসঙ্গিক মনে করিয়া নিম্নে দিলাম।

রাগিনী—দুর্গা—একতালা

সময় আখেরী হইল হে হরি,
উপায় কি করি বল না হে,
শমন-কিঙ্করে লয়ে যাবে ধ'রে
কারো কথা শুনিবে না হে।

ডাকি ডাকি ক'রে দিন বয়ে গেল,
পথের সম্বল কিছু না হইল,
মোহমুগ্ধ মন তোমা পাশরিল,
ভুলেও তো তোমায় ডাকে না হে।
গুরো! দয়াময় অধম তারণ,
মো সম অধম আছে কোন জন,
দীন সীতারামে কর হে তারণ,
চরণে শরণ নিলাম হে।

সীতারাম দাদা গত বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। অনাদি বাবুও পরলোক গিয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পরে বাবার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। বরদাবাবু এ রাস্তায় আসেন নাই। আমার তৃতীয় চাকরীস্থল চৌরাসী কলিয়ারীতেই শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ রায় দাদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তখন বড় নামজাদা Sinking Contractor ও দানী ছিলেন—দুর্ভিক্ষ সময়ে গ্রামের ও পাশের লোকজনের অভাবে বহু দান করিতেন। সুখের বিষয় এখনও তিনি জীবিত আছেন ও শ্রীগুরুর চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরু-স্মৃতি-প্রসঙ্গ

শ্রীবীণাপাণি দেবী

(আমার দীক্ষার ইতিহাস)

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার মাসীমাতা শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেবী বড় দিনের ছুটিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ৺কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তিনি পরমারাধ্যপাদ শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট ১৭ই পৌষ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এইরূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল। স্বামীজী তখন কাশী হনুমান্ ঘাটের আশ্রমে থাকিতেন। মালদহিয়ার বাগান, যাহাতে পরে আশ্রম ও দেব-মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়াছে, তখন খরিদ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সেখানে থাকিবার সুবিধা হয় নাই বলিয়া স্বামীজী পূর্ব্বাশ্রমেই অবস্থান করিতে-ছিলেন। মাসীমা ও মেসোমহাশয় দীক্ষার পূর্ব্বদিন শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আমাকে সঙ্গে নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি যাইতে সম্মত হইলাম। সাধারণতঃ আমি বাহিরে কোথাও যাইতাম না, কারণ বাল্যাবস্থাতে বিধবা হওয়ার দরুণ আমাকে সর্ব্বদাই আমার পূজনীয় মাতামহের নিরীক্ষণের অধীনে থাকিতে হইত। তিনি সাধারণতঃ আমাকে কোথাও বাহিরে যাইতে দিতেন না।

আমরা যথাসময় হনুমান ঘাটের আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে যাইয়াও তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিল

না- শুনিলাম তিনি পূজায় বসিয়াছেন। তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে মনে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। যাহা হউক— দুই তিন দিন পরে মাসীমার সঙ্গে দুর্গাবাড়ী ও উহার সন্নিকটে ভাস্করানন্দজীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে বাবাকে দর্শন করিয়া ফিরিবার জন্য হনুমান ঘাটের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম বাবা এইমাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উপরে উঠিলাম। দেখিলাম বাবা খাটের উপর আসনে বসিয়া আছেন। মেসোমহাশয় ও মাসীমা তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। আমি অদূরে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি একদৃষ্টে দেখিতেছিলাম যে, বাবার দেহ হইতে উদয়কালীন সূর্য্যের রক্তবর্ণ কিরণ-ছটার ন্যায় জ্যোতি বাহির হইতেছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইতেছিল সকলে যেন কতদূর হইতে কথা বলিতেছেন। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাসীমাকে বলিলেন—"মেয়েটি কে গো? বেশ মেয়েটি ত।" তখন মাসীমা বাবার নিকট আমার পরিচয় দিলেন ও আমাকে বাবার চরণে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইলাম। নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি বলিলেন,—"ভয় কি গো? ভালই ত।" তাঁহার এই বাক্যের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সকলে ইহা বুঝিতে পারিল না।

আমি তের বৎসর বয়সের সময় হইতে হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি।

ডাক্তার, বৈদ্য ও ওঝাদের প্রতিকারের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমার রোগ না কমিয়া ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার মাতামহ ও মাতামহী আমার জন্য খুবই চিন্তিত থাকিতেন। একদিন আমাদের বাড়ীতে আমার মামাত ভাইয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমার মামার শ্বশুর ৺রাধিকাপ্রসাদ বাপুলী মহাশয় আসিয়াছিলেন। আমার এই মামা দাদা মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতার পুত্র। বাপুলী মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং প্রতিকারের জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। গুরুদেব তখন মালদহিয়ার আশ্রম-বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাপুলী দাদু গুরুদেবকে অনুরোধ করার পর দেখা গেল গুরুদেব হঠাৎ নীচু হইয়া ভূমি হইতে একটি শিকড় তুলিয়া লইলেন ও উহা দাদুর হাতে দিয়া তাঁহাকে বলিলেন উহা যেন আমার গলায় মাদুলীতে ভরিয়া ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি আরও বলিয়া ছিলেন যে, আমি যেন কোন ক্রমেই পেঁয়াজ, রশুন স্পর্শ না করি। আহার্য্যরূপে বিধবার পক্ষে পেঁয়াজ রশুনের ব্যবহার সম্ভবপর নহে, ইহা তিনি জানিতেন। তাই—স্পর্শ করার জন্য নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাবার আদেশ অনুসারে আমি মাদুলী ধারণ করি এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার হিষ্টিরিয়া নিবৃত্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কোন কারণ বশতঃ অজ্ঞাতসারে পেঁয়াজ স্পর্শ হইয়াছিল বলিয়া পুনরায় ঐ রোগ আক্রমণ করে। তখন আবার রাধিকা দাদুকে খবর দেওয়া হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মালদহিয়া আশ্রমের বাগানে যাইয়া সেই গাছটিকে খুঁজিয়া

বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বাগানে আর সেই গাছটি দেখিতে পান নাই। তখন বাবা কাশীতে ছিলেন না। তাই তাঁহাকে জানাইবার সুবিধা হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি কাশীতে আসিলে রাধিকা দাদু তাঁহাকে আমার অবস্থা নিবেদন করেন। বাবা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"কিগো, তুমি ত আমার অসাক্ষাতে ঔষধটি চিনিয়া রাখার জন্য ইট ফেলিয়াছিলে। তুমিই ত ঔষধটি তুলিয়া দিতে পারিতে।" ইহা শুনিয়া রাধিকা দাদু অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, কারণ বাবা ঠিকই বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর তিনি দাদুকে বলিলেন—"যাও, তুমি মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়া আসিও। আমি নিজের হাতে তাহাকে ঔষধ দিব।"—ইহার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় রাধিকা দাদু আমাকে হনুমান ঘাটে বাবার কাছে লইয়া যান। আমি বাহিরে দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিলাম। সেইখানেই হঠাৎ খুব আশ্চর্য্যজনক অপূর্ব্ব গন্ধ পাইলাম। কিন্তু এই দিব্য গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছি বাবার গাত্র হইতে এইরূপ গন্ধ বাহির হইত। বাবা তখন খাটে বসিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে ডাকিয়া ঔষধটি আমার হাতে দিলেন এবং ভৎর্সনার সুরে আমাকে বলিলেন, "তুমি বড় অসাবধান। আবার যদি ভুল কর আর ঔষধ দিব না। খুব সাবধানে থাকিবে।" সেইদিন হইতে আমি হিষ্টিরিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলাম।

উহার পর আর কখনও ঐ রোগ আমাকে আক্রমণ করে নাই।

ইহার পর হইতে প্রায়ই বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু আমি ইচ্ছানুসারে যাইতে পারিতাম না। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক ভাড়াটিয়া আসিলেন। তখন আমার দাদু আমাদের বাড়ীর নীচের ও মাঝের তালা ভাড়া দিতেন। ঐ মহিলাটির নাম ছিল পদ্মিনী দেবী। ইনি আমার গুরুভগিনী ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার ঘরে বাবার ফটো টাঙ্গান রহিয়াছে। তিনি বাবার শিষ্যা ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলাম যেন তিনি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যান। কিন্তু তিনি দাদুর বিনা অনুমতিতে আমাকে নিয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না, নানা প্রকার স্তোক-বাক্যে আমাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কয়েকদিন কান্নাকাটি করার পর তিনি দিদিমার অনুমতি পাইয়া আমাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মালদহিয়া আশ্রমে অবস্থানের উপযোগী কিছু ঘর-বাড়ী হইয়াছে এবং বাবা হনুমান্ ঘাট হইতে উঠিয়া ওখানে আসিয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাবা আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন —"পালধিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আস নাই কেন? তোমার দাদুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করা তোমার উচিত নহে। ইহার পর যখন আসিবে দাদুকে বলিয়া আসিবে।" আমি বাবার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলাম। কারণ আমি সত্যই সেইদিন দাদুকে না জানাইয়া গোপনে আসিয়াছিলাম। তখন আমি

বাবাকে বলিলাম—"তিনি জানিতে পারিলে আমাকে কখনই বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না।" তখন বাবা হাসিয়া বলিলেন, "সে চিন্তা তোমার নয় গো! সব ঠিক হইয়া যাইবে। গোপনে কাজ করা ভাল নয়।"

আমি সেইদিন হইতে যখনই অবসর পাইতাম বাবার নিকট যাইতাম, অবশ্য দাদুকে বলিয়া। কিন্তু প্রত্যেকবার দাদুর সঙ্গে রাগারাগি করিয়া যাইতে হইত। তিনি বলিতেন—"লোকে ঠাকুর দর্শন করিতে যায়, তুমি কি জন্য যাও? তিনি ত তোমার গুরু নন।" আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিতাম না, কেন যে চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম হইত তাহাও তখন বুঝিতাম না। তখন দাদুকে বলিতাম—"হাঁ, আমি যাইব। তুমি বাধা দিও না। দাদু, তোমার কাছে আমার এই একটি মাত্র প্রার্থনা—তুমি নিষেধ করিও না।" আমার আগ্রহ দেখিয়া দাদু আর আপত্তি করিতেন না। এইভাবে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। দাদু একদিন প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন,—"দীক্ষা অভিলাষী হইয়া যাইও না। কারণ, যাহা তুমি জান না তাহা লইয়া বাচালতা করা উচিত নহে। যদি তিনি তোমার গুরু হন, তিনি নিজেই তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। তুমি কখনও তাঁহার মুখের দিকে চাহিও না। একমাত্র তাঁহার চরণের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে। কারণ গুরুর চরণের সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ। তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য।" ইহার পর বাবার কাছে যখনই যাইতাম ঐভাবে বসিতাম।

এই প্রকারে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

একদিন অগ্রহায়ণ মাসে বাবার কাছে বসিয়াছিলাম, বাবা শুইয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বীণা, আমার দিকে চাও তো। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখপানে তাকাইলাম।" বাবা বলিলেন—"তুমি এখানে আমার কাছে আস কেন বলিতে পার কি ?" এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম। কারণ আমি ভাবিলাম আমার হয়তো কোন অপরাধ হইয়াছে এবং তাহাতে বাবা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অভিমানে চক্ষুতে জল আসিয়া পড়ায় আমি চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলাম, "তাহাত জানি না বাবা। তবে আপনার নিকটে থাকিতে বা বসিতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি আসি।" বাবা এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং আমাকে বলিলেন— "বীণা, আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ তাহাত তুমি জান না। জানিলে সব রহস্য তোমার নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইত। তুমি কি আমার কাছে দীক্ষা নিবে ?" বাবার এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক্! কারণ ইহাই ত ছিল আমার অন্তরের প্রার্থনা। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এতদিন পরে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং পরে বলিলাম—"যদি তোমার দয়া হয়। কি করিতে হইবে তাহাত কিছুই জানি না। আমাকে সব বুঝাইয়া দিতে হইবে।" যাহা যাহা আবশ্যক বাবা বলিয়া দিলেন। আমি আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দৌড়িয়া উপরে উঠিলাম ও দাদুকে বলিলাম—"দাদু, বাবা ভগবান্ আজ আপনা হইতেই আমাকে দীক্ষা দিবেন

বলিয়াছেন। সত্যই আমি এ বিষয় তাঁহাকে পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই। আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ দীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে। তোমার কি ইচ্ছা?" দাদু বলিলেন—"ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি যাঁহাকে গুরু ও ঈশ্বর ভাবিতেছ তাঁহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাকুলভাবে স্মরণ কর। এখনও তো চারি পাঁচ দিন বাকী—এত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না।"—দাদুর এই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। রাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—"তুমি এ সব কি বলিতেছ? তুমি কি চাও না, আমি তাঁহার কাছে দীক্ষা লই? তুমি তো প্রথম হইতেই বাধা দিতেছ। আমি একটু ঠাকুর পূজা করিব ও উহাই নিয়া থাকিব। দাদু, তুমি ত বলিয়া থাক ভগবানে দৃঢ়তা হইলে ও আত্মসমর্পণ করিলে শান্তি পাওয়া যায়। তুমিতো কতবার আমাকে বলিয়াছ বৃথা সংসারে সুখ পাই নাই বলিয়া আমি যেন দুঃখ না করি। আজ যদি বাবা দয়া করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিবার পথ বলিয়া দেন তাহা হইলে তাহা হইতে সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে এই সব কথা বলিতেছ কেন?" এই বলিয়া আমি দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিতে লাগিলাম। দাদু হাসিয়া বলিলেন—"দূর, বোকা মেয়ে, যে যার গুরু আগে হইতেই ঠিক হইয়া আছে। তুই এত ভাবছিস কেন? প্রাণভরে তোর গুরুকেই ত আঁকড়াইয়া ধরিতে বলিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি তুলসীদাসের একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন। আজও আমি মাঝে মাঝে উহা স্মরণ করিয়া থাকি। দোঁহার একটি পদ এই,—'জো রাম খেলওনা জানা সো

রাম তুমসে ভী সেয়ানা।' তিনি আরও বলিলেন—"তুমি যা চাইছ তোমার ভিতর যে রাম আছেন তিনি সে সব জানছেন। অত উতলা হইও না। যদি তুমি গুরু ও ভগবানে অভেদ-বুদ্ধি আনিতে চাও তোমার প্রথম সাধনা হইবে ধৈর্য্য। আমিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার সদ্‌গুরু লাভ হউক।"

যেদিন আমার দীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তাহার একদিন পূর্ব্বে দাদু কিছু রং কিনিতে গোধুলিয়ার বাজারে গিয়াছিলেন। সেখানে মল্লিকের দোকানে তিনি শুনিতে পাইলেন যে দুইজন লোক পরস্পর কথা বলিতেছে। তাহা হইতে তাঁহার ধারণা হইল যে ঐদিনই বেলা ১১টার গাড়ীতে বাবা কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। তখন দাদু সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি গন্ধ-বাবার কথা বলিতেছেন? তাঁহার ত এখন যাওয়ার কথা ছিল না।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আমি ঠিক জানি না তিনি কেন গেলেন। হঠাৎ গিয়াছেন। আমি যাওয়ার পূর্ব্বে সংবাদ পাই নাই।" যাহা হউক, দাদু বেলা প্রায় বারটার সময় বাড়ী ফিরিলেন। আমি দাদুর আসার বিলম্ব দেখিয়া খাইতে বসিয়াছিলাম। দাদু ঘরে ঢুকিয়া আমাকে বলিলেন—"তুই তো মনের আনন্দে মস্‌গুল যে পরশু দিন মন্ত্র পাবি; কিন্তু আমি এই মাত্র দোকানে শুনিয়া এলাম যে, গন্ধ-বাবা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি নাই।" জানি না কেন এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষু হইতে জলের ধারা বহিতে লাগিল। আমি আর ভাত খাইতে পারিলাম না। কেবলই আমার মনে এই প্রশ্ন

উঠিতে লাগিল, 'বাবা কেন আমাকে দীক্ষা দিবেন বলিয়া দীক্ষার পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন।' দাছু আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও বলিলেন, "দেখ, তুলসীদাস বলিয়াছেন 'হাসি হাসি কঈ নহীঁ পায়া, জিন্হে পায়া সো রোয়া।' তুমি কি দীক্ষা পাওয়া এত সহজ ভাবিয়াছ ? গুরুর কৃপার ভিখারী হইয়া মনে মনে তাঁর কাছে কান্নাকাটি কর। দেখ্‌বে তাঁর দয়া নিশ্চয় হবে। বৃথা চিন্তা ক'রো না।"

ইহার পব দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর দুর্গাপূজার সময়ে শুনিতে পাইলাম বাবা কাশীতে আসিয়াছেন এবং মালদহিয়ার আশ্রমে আছেন। কিন্তু তিনি আসিয়াছেন শুনিয়াও তাঁহার নিকট যাইতে আমার কোন আগ্রহ হইল না, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান আমাকে বাধা দিতে লাগিল। বাস্তবিক পক্ষে যাওয়ার ইচ্ছা খুবই হইত, কিন্তু অভিমানবশে যাইব না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। এই বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষে একটু তীব্র যাতনাও মনে মনে অনুভব করিতাম। তখন কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির সময়। কুসুম নামে একটি বৈষ্ণবী তখন মিসরীপোখরায় থাকিত। আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমি জানিতাম সে মাঝে মাঝে বাবাকে দর্শন করিতে আশ্রমে যাইত। সে ভাল গান করিতে পারিত। কখনও কখনও বাবাকে গান করিয়া শুনাইত। আমি কোন কোন দিন তাহাকে দেখিতে পাইতাম। ঐ সময়ে সে হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে বলিল, "বীণা, তুমি মালদহিয়া বাবার আশ্রমে

যাও নাই কেন? আমাকে একদিন গন্ধ-বাবা ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি পালধি মহাশয়ের নাত্নীকে চেন কি? তাহাকে বলিও আমি তাহাকে ডাকিয়াছি।'" ইহা শুনিয়া আমি কুসুম বৈষ্ণবীকে একটু রাগের সহিত বলিলাম,—"না, আমি কখনই যাইব না।" তখন কুসুম আমাকে বলিল—"তুমি যাহা ভাল বুঝ করিও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি অভিমানের বশে মনে করিতাম যে আমার প্রতি বাবার কৃপা নাই, হয়তো তিনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাবা যে কত করুণাময়, তিনি যে আমাদের কত দুর্ব্বলতা হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাহা ত তখন বুঝিতে পারিতাম না। আমি বলিলাম বটে 'যাব না', কিন্তু না যাইয়া থাকিতে পারিতাম কৈ? পরদিন দাছুকে বলিয়া বৈকালবেলায় বাবার কাছে গেলাম এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে বাবা বলিলেন—"কিগো, খুব রাগ হয়েছে? মনে হচ্ছে বাবা মিথ্যাবাদী, প্রতারক ইত্যাদি। কি করব বাপু? এত ছেলেমেয়ে, কাকে সামলাই? আচ্ছা, রাগ করো না, আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার তোমাকে দীক্ষা দিব। কেমন—কি বল?" ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখের ও রাগের সহিত আমি বলিলাম—"আমি কিছু জানি না। আবার যদি আপনি কলিকাতা চলিয়া যান, তখন কি হবে?" এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। নিকটেই রাধিকা দাছু বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বাবা বলিলেন—"দেখতো কি পাগল মেয়ে। ওহে রাধিকা শুন, তুমি

মঙ্গলবার ভোরে মেয়েটিকে নিয়ে এসো। কিন্তু যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে না আস তা হ'লে কিন্তু মন্ত্র-টন্ত্র পাবে না, বাপু। তখন যেন আবার রাগ টাগ করো না।"

সেইদিন হইতে কি ভাবনা, কি উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছি বাবাই জানেন। ৫ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা বেলায় রাধিকা দাদু আমাকে বলিয়া গেলেন, তিনি ভোর চারিটায় আসিবেন, আমি যেন তৈয়ার থাকি। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। দাদুকে বলিয়া রাখিলাম যে, যদি আমি ঘুমাইয়া পড়ি, তিনি যেন আমাকে জাগাইয়া দেন। আমি সারারাত্রি লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোর কাছে বসিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম যেন আমি ঘুমাইয়া না পড়ি। আমি শিশুকাল হইতে—মাতামহের গুরুদেব ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোকেই ভগবান্‌রূপে পূজা করিতাম এবং আমার অভাব বেদনা সবই তাঁহাকে নিবেদন করিতাম। রাত্রি তিনটার সময় স্নান সারিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। চারিটার সময় রাধিকা দাদু আসিয়া আমাকে ডাকিলেন।

আমরা যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন কেবল মাত্র দরজা খোলা হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া জানিলাম, বাবা এখনও দরজা খোলেন নাই। তখন মালদহিয়া আশ্রমে বেশী ঘর দুয়ার হয় নাই। এখন ভোগ মন্দিরের পাশে যে ঘরটিতে মার্ব্বেলের টালী পাতা আছে ঐ ঘরের পাশের ঘরেই বাবা অবস্থান করিতেন। উহার সম্মুখে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল। আমি সেইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবা দরজা

খুলিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন আমার শরীর এত কাঁপিতেছিল যে, বাবা যদি আমার হাত না ধরিতেন তবে আমি পড়িয়া যাইতাম। বাবা বলিলেন, "ভয় কিগো? এই আসনে বসো।" গুরুদেবের পাশেই আমার আসন পাতা ছিল। আমি তাহাতে বসিলাম। এই পর্য্যন্তই মনে আছে, তাহার পর আর কিছুই মনে নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর আমার যখন বাহ্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তখন বাবা বলিলেন—"চরণামৃত হাত পাতিয়া নেও এবং আমি যাহা বলিতেছি ও দেখাইতেছি তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। দরকার বোধ করিলে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

ইহার পর বাহিরে আসিয়া রাধিকা দাদুকে বলিলেন— "মেয়েটি বড় সরল। ক্ষেত্রটি ভাল, তবে ক্রোধ রিপুটি একটু প্রবল।" আমাকে বলিলেন—"দেখ মা, মন দিয়ে ক্রিয়া করিও। সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যে তখন তোমায় দীক্ষা দিই নাই তাহার কারণ অসময়ে বীজ রোপণ করিলে ভাল ফলের আশা করা যায় না। সেদিন তোমার জন্যই আমাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। গুরুর দায়িত্ব যে অনেক, বাপু। ক্রিয়া খুব মন দিয়া করিবে, তবেই ইহার মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে। এটি মনে রাখিও আজ থেকে তুমি যা করিবে বা ভাবিবে আমি তা বুঝিতে পারিব। তুমি যদি আমার কাছে থাক দেখিবে তোমার কাছে আমিও থাকিব এবং উহা সময় সময় প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।" বাবার এই বাক্য যে কত সত্য এবং কত সময়ে কত রকম ভাবে

যে তিনি দর্শন দিয়াছেন তাহা সুযোগ পাইলে পরে আবার বলিব ইচ্ছা রহিল।

দীক্ষা গ্রহণের পর আমি অতি আনন্দের সহিত পরিপাটি করিয়া বাবার ফটোটি রাখিয়া ফুল দিয়া সাজাইলাম এবং সন্ধ্যাবেলায় ধূপ ধুনা দিয়া ক্রিয়া করিতে বসিলাম। ইষ্ট চিন্তা করিয়া ক্রিয়া করিতে যাইতে হয়। কিন্তু যতই ধ্যান করি ইষ্ট-মূর্ত্তি না ফুটিয়া বাবার শ্রীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন মনে অত্যন্ত ভয় হইল, কারণ বাবা বলিয়াছিলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। মনে হইল তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে পূজা করিতে পারিতেছি না বলিয়া তিনি অবশ্যই রাগ করিবেন। তাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেন তিনি আমাকে ঠিকভাবে পূজা করিবার সামর্থ্য দেন। ভাবিলাম ভোরে আবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। শোয়ার সময় দাদু ও দিদিমাকে বলিয়া রাখিলাম যেন তাঁহারা আমাকে ভোরে ডাকিয়া দেন। কিন্তু ভোরে নিজে হইতেই উঠিলাম। পূজায় বসিলাম বটে, কিন্তু আসনেই অবশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালবেলা ছয়টা অথবা সাতটার সময় ছেলেপেলের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ও ভয় পাইলাম। বাবা বকিবেন ভয়ে কয়েকদিন আশ্রমেও যাই নাই। মনে সর্ব্বদাই ভাবনা ও হতাশ ভাব লাগিয়া থাকিত, কিছুই ভাল লাগিত না। খাওয়াতেও রুচি ছিল না। কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব সর্ব্বদাই থাকিত। ইহা দেখিয়া দাদু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর কি হয়েছে? এমন হয়ে থাকিস্ কেন?" শিশুকালে মাতৃহীন ও

বাল্যকালে বিধবা হওয়ার দরুণ তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমিও দাদুকে আর সকলের চেয়ে আপন মনে করিতাম। যখন যাহা দুঃখ কষ্ট হইত তাঁহার কাছে অসঙ্কোচে বলিতাম। তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, "বাবা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারিতেছি না। তিনি তো সঙ্গে থাকিয়া সব দেখিতেছেন, তাই ভয় হইতেছে। কি করি?" দাদু বলিলেন—"সেজন্য এত ভাবনা কিসের? তিনিতো দেখিতেছেন তুমি চেষ্টা করিয়াও পারিতেছ না। তিনি ত এখন এখানেই আছেন। কাল আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে বল, তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন। গুরু যে বড় দয়াল। তাঁহাকে কখনও ভয় করিও না। তাঁহাকে ভাল বাসিবে। আমার চেয়েও তিনি তোমার আপন জন। যে কথা আমায় তুমি বলিতে পারিবে না তাও তুমি তাঁহাকে বলিবে। তোমার সুখ দুঃখের ভার তিনি নিজের মঙ্গল হস্তে তুলিয়া নিয়াছেন, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও, জীবনের এক মুহূর্ত্তেও এটি ভুলিও না। ইহাই তোমার প্রতি আমার আদেশ।"

সন্ধ্যায় আহ্নিক করিতে বসিয়া একটি ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এটি ইষ্ট মূর্ত্তিও নয়, বাবার মূর্ত্তিও নয়। উহা কি মূর্ত্তি বুঝিতে পারি নাই। ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলাম। চীৎকার করিয়া উঠিতেই দিদিমা আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেন। সেই শব্দে উঠিয়া কপাট খুলি। পরদিন আশ্রমে যাইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম সকলের সামনে কি করিয়া বাবাকে এ সব কথা বলিব?

কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিলেন—"দেখ বাপু, ক্রিয়া করিবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া কেহ কেহ ঘুমায় এবং লোককে বুঝায় যে পূজা করিতেছে। এ অবস্থায় শয়তান তার ঘাড়ে চড়িতে পারে, যেমন কাল বীণার কাছে গিয়াছিল।" আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"নয় কি? সত্য সত্য বলতো এদের সাম্নে।" এই বলিয়া বাবা হাসিতে লাগিলেন। আমি সকলকেই সন্ধ্যার ঘটনা বলিলাম এবং সত্যই যে আমি ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়ি তাহাও বলিলাম। ক্রিয়া যে তাঁহার কথা মত হয় না তাহাও জানাইলাম। বাবা বলিলেন,—"বার বার অভ্যাস কর। ঠিক হলে অনেক কিছু দেখ্‌বে শুন্‌বে গো। ওসব হয়ে থাকে। ওর জন্য তোমার কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই।"

বিহঙ্গম-যোগ ও মহাপথ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে যোগ সাধনার বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। যোগপথের বহু ভেদ এইদেশে প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচ্ছন্নভাবে কিছু কিছু আছে। কিন্তু সাধারণ জিজ্ঞাসুর পক্ষে ঐ গুহ্য সাধন-পন্থার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যোগের শ্রেণী-বিভাগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন প্রকারে করা হইয়া থাকে। সন্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগ-মার্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে একটির নাম 'পিপীলিকা-মার্গ' এবং অপরটির নাম 'বিহঙ্গম-মার্গ'। এই দুই প্রকার 'যোগে'র আপেক্ষিক উৎকর্ষ বিচার করিলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে 'পিপীলিকা যোগ' অপেক্ষা 'বিহঙ্গম-যোগ' শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অধিকারের তারতম্য অনুসারে যোগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়া থাকে। বিহঙ্গম-যোগ শ্রেষ্ঠ হইলেও পিপীলিকা-যোগের অধিকারীর পক্ষে ইহা উপাদেয় নহে। তদ্রূপ পিপীলিকা-যোগ অপেক্ষাকৃত নিম্নকোটিতে পরিগণিত হইলেও সাধারণ অধিকার-সম্পন্ন যোগাভ্যাসীর পক্ষে উহাই শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ যাহাকে হঠযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা পিপীলিকা-যোগেরই একটি প্রকার ভেদ মাত্র। এই

প্রক্রিয়াতে আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা প্রভৃতি সহায়ক হইয়া থাকে, এবং সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াও ঐ জাগ্রৎ শক্তি দ্বারা মানব দেহস্থ ষট্‌চক্র নামক ছয়টি শক্তিকেন্দ্রকে ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে হয়। তাহার পর সহস্রারে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা আবশ্যক হয়। সহস্রারে স্থিতি প্রাপ্ত হইলে এই যোগী লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নিজেকে কৃতকার্য্য মনে করে। পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করাই এই যোগের উদ্দেশ্য। আজ্ঞা-চক্রের ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দু ভেদ করিয়াই পিণ্ড অর্থাৎ ব্যষ্টি-দেহ হইতে (Microcosm) ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সমষ্টি-দেহে (Macrocosm) প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু 'বিহঙ্গম-যোঁগ' নানা কারণেই পূর্ব্বোক্ত যোগ হইতে মহত্তর। অধিকাংশ সন্ত নিজেদের সাধন-জীবনে ইহারই অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। পিপীলিকা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়, কিন্তু বিহঙ্গম অথবা পক্ষী ভূমিকে আশ্রয় না করিয়া নিরালম্ব আকাশ-মার্গে মনের আনন্দে স্বেচ্ছানুসারে অগ্রসর হয়। একজন সন্ত বলিয়াছেন,—

"বিঁহঙ্গম চঢ়ি গয়উ অকাসা,
বৈঠি গগন চঢ়ি দেখু তমাসা—"

যোগী যখন শূন্য-গগনে বিচরণ করে ও নিরন্তর অমৃত পান করে তখন এই ক্ষুদ্র দেহপিণ্ডের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। ঐ অবস্থায় যোগীর দৃষ্টি অষ্টদল কমলস্থিত সূচীপ্রমাণ সূক্ষ্মদ্বার ভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে ও ত্রিবেণীতে অবগাহন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। ইহার পর যথাসময় ভ্রমর-

গুহাতে প্রবেশ হয়। এই গুহা মধ্যে নিরন্তর শব্দের গুঞ্জন হইয়া থাকে। নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর রূপ ও দিব্য গন্ধ সর্ব্বদাই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই যোগী সাধক অলৌকিক ও নির্মল দর্শন-শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম দিব্যচক্ষু লাভ। ভ্রমর-গুহা হইতে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ। সত্যরাজ্যে সত্যস্বরূপ নিরাকার চিন্ময় পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকেন। উদ্যমশীল যোগী সত্যরাজ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখে না, কারণ সত্যরাজ্যেরও একটি 'পরাবস্থা' আছে। সত্যরাজ্যে কথা বলা যায় এবং কথা শোনা যায়, যদিও সে কথা নিঃশব্দ বাণীমাত্র, এবং সেখানে মিথ্যার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সত্যরাজ্যের ঊর্দ্ধে শব্দের গতি নাই। সেই শব্দহীন রাজ্য হইতে একটি ঊর্দ্ধ কেন্দ্রে ঊর্দ্ধ-প্রবাহের ফলে আরোহণ ঘটিয়া যায়—ঐস্থানে গমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে 'অগমলোক' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সাধক ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।

হঠযোগ অত্যন্ত জটিল ও কঠিন, এবং অনেকের পক্ষে উহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিহঙ্গম-যোগ এত সহজ যে এই সরলতার জন্য কোন কোন সন্ত ইহাকে 'সহজ-যোগ' বলিয়াও আখ্যা দিয়া থাকেন। পিপীলিকা-যোগের দ্বারা যোগী নিজ দেহকে আয়ত্ত করিতে পারে ইহা সত্য, কিন্তু আত্মাকে আয়ত্ত করিতে হইলে আরও কিছু আবশ্যক। শুধু প্রাণায়ামাদি সাধন ঐ মহান্ উদ্দেশ্যের সিদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

মনুষ্য বিচিত্র অধিকার সম্পন্ন, সেইজন্য তাহার সাধন-প্রণালীতেও একটি সমন্বয়ের ভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। সন্তগণ বলেন যে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দুইটি পথের সামঞ্জস্য আবশ্যক। ষট্‌চক্রের ক্রিয়া দ্বারা অষ্টদল কমলের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, অথচ অষ্টদল কমলের সাধনাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে আত্মসিদ্ধির অনুকূল সাধন ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য যদিও বিহঙ্গম-যোগ শ্রেষ্ঠ, তথাপি সন্তগণ উভয় মার্গের সমন্বয়ের পক্ষপাতী।

বিহঙ্গম-যোগের সহিত পিপীলিকা-যোগের মিলনের জন্য যোগীর পক্ষে চতুর্দ্দশ তত্ত্বের অনুশীলন উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই চতুর্দ্দশ তত্ত্বের মধ্যে ছয়টি চক্র-স্বরূপ এবং বাকী আটটি অষ্টদল কমলের দল-স্বরূপ।

নবদ্বার ও পঞ্চতত্ত্ব এই উভয়ের মিলনে যে চতুর্দ্দশটি সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাও এই সমন্বয় সাধনার আলোচ্য তত্ত্বের অন্তর্গত।

প্রসিদ্ধ সন্ত দরিয়া সাহেব তাঁহার "শব্দ" নামক গ্রন্থে বিহঙ্গম-যোগের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে বোঝা যায় যে 'সুরতি' ও 'নিরতি' এই দুইটির সমন্বয় করিতে পারিলেই যোগ-সাধনা সিদ্ধ হয়। 'সুরতি' বলিতে অসাধারণ দৃষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। এই দৃষ্টির উন্মীলন হইলে নানা প্রকার অপরূপ দৃশ্য ও শব্দের অনুভব ঘটিয়া থাকে। 'নিরতি' শব্দে বুঝায় নির্ব্বিকল্প ধ্যান। ইহাতে দৃশ্যের ভান মোটেই থাকে না। যোগক্রিয়া লৌকিক মন্থন-ক্রিয়ারই অনুরূপ। একই মন্থন-ক্রিয়াতে যেমন দুইটি

ছোড় আবশ্যক হয়, যাহা দ্বারা ভাণ্ড মধ্যে দধি মথিত করিয়া ঘৃত বাহির করা যায়, তেমনি এই শরীররূপী ভাণ্ডে যোগক্রিয়ারূপ মন্থনকার্য্য সাধন করিতে হইলে সুরতি ও নিরতি এই উভয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক। তাহা হইলে স্থিরতারূপ ঘৃতের প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিরতিহীন অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ধ্যানরহিত শুদ্ধ সুরতি যেমন সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী নহে, তদ্রূপ অসাধারণ দৃষ্টিরূপ সুরতিবর্জ্জিত শুদ্ধ নিরতি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ধ্যানও উপযোগী নহে। উভয়ের সামঞ্জস্য হইতেই যোগী ইষ্ট-সাধনাতে সফলতা লাভ করে।

সন্তগণ বলেন, মানুষের প্রতি চক্ষুতে চারিটি অবয়ব আছে, সুতরাং তাহার দুইটি চক্ষুতে আটটি অবয়ব আছে। এই আটটির সমষ্টিকে অষ্টদল কমল বলে, কারণ প্রত্যেকটি অবয়বই কমলের এক একটি দলস্বরূপ। এই চারিটি অবয়ব কি, তাহার নির্দ্দেশ সন্তগণ স্পষ্টভাবেই করিয়াছেন। প্রতি চক্ষুতে যে চারিটি অংশ আছে তাহা এই :—(১) চক্ষুর উজ্জ্বল তারা, (২) উহার অন্তরস্থিত নর্ত্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালোবর্ণের পুত্তলি, (৩) কেন্দ্রস্থিত তারকাবৎ ছোট পুত্তলি ও (৪) তারকার অন্তঃস্থিত সূচী-ছিদ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বিন্দু (যাহার নামান্তর অগ্রনখ বা সূচী)। মোট চারিটি। দুই চক্ষুতে এইরূপ আটটি অবয়ব অথবা দল আছে।

সন্তগণ বলেন, এই যে অগ্রনখের কথা বলা হইল ইহাই অগ্রদৃষ্টি। সুরতি এই অগ্রদৃষ্টি বা অগ্রনখরূপে পরিণত হইয়া অষ্টদল কমলকে ভেদ করে। তখন ইড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা

ত্রিবেণী-সঙ্গমে একাকার হইয়া যায়। একাগ্রতা প্রভাবে সুরতিকে অগ্রনখের ভিতরের দিকে প্রেরণ করিতে হয়, এই প্রক্রিয়ার নাম উন্মনী মুদ্রা। ইহা যে মহামুদ্রা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুরতি যতই অগ্রনখের ভিতরের দিকে অগ্রসর হয় ততই চঞ্চল মন স্থির হইতে থাকে।

বিহঙ্গম-যোগে বঙ্কনালের স্থান অতি উচ্চ। হঠযোগে মেরুদণ্ডের প্রাধান্য যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, ধ্যানযোগে ঠিক সেই প্রকার বঙ্কনালের প্রভাব যোগি-সমাজে প্রসিদ্ধ। বঙ্কনাল একটি বিশিষ্ট নাড়ীর নাম,—ইহা মূলাধার হইতে উদ্গত হইয়া নাভির বামভাগ দিয়া উঠিয়া হৃদয় ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করার পর আজ্ঞাচক্রস্থিত রুদ্রগ্রন্থিতে মিলিত হয়। তাহার পর রুদ্রগ্রন্থি হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে। অনন্তর মস্তকের পশ্চাতের দিকে বক্রভাবে কতকটা ঝুলিয়া পড়ে এবং পুনরায় উপরের দিকে উঠে। এই স্থানে এই নালটি অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানেই ইহা বঙ্কনাল নামে সন্ত-সাহিত্যে পরিচিত। ইহার পর এই নাড়ী ধুন্ধকার মণ্ডল পার হইয়া মহাশূন্যের প্রান্তে ভ্রমর-গুহাতে প্রবেশ করে। ভ্রমর-গুহা সত্যরাজ্যের দ্বারস্বরূপ।

ভ্রমর-গুহাতে দৃশ্য কিছুই নাই, বস্তুতঃ ইহা শূন্যস্থান। তাই ইহাকে গুহা বলা হয়। এইখান হইতেই যোগী বিশুদ্ধ শব্দ শুনিতে পান। এই শব্দের প্রভাবে সত্যরাজ্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই যে শব্দ-শ্রবণ ইহা যোগিগণের সুপ্রসিদ্ধ নাদানুসন্ধানেরই একটি অবস্থা। সন্তগণ বলেন এবং

আগম ও নিগম সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে যে ব্রহ্মস্বরূপ এই শব্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ, মর্ত্ত্যলোক ও পাতাল ইহা হইতেই উদ্ভূত। যে শূন্য-মণ্ডলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এবং যাহাকে শব্দের আলয় বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভ্রমর-গুহার অন্তর্গত। সুরতি, নিরতি, মন ও প্রাণ এই চারিটির একাগ্রতা হইলে শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সন্তগণ বলেন, ধ্বনি হইতে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় ধ্বনিতে শব্দ লীন হয়। সদ্‌গুরু অথবা সৎপুরুষের সাকার রূপকেই সন্তগণ 'ধ্বনি' বলিয়া থাকেন। দুইটি শ্বাসের পরস্পর আঘাতে শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং একাগ্রতার ফলে উহা শ্রুত হয়। শব্দ-শ্রবণের প্রভাবে মন নিয়ন্ত্রিত হয় ও নিজেকে সৎ পুরুষে নিমগ্ন করিতে পারা যায়। ঐ শব্দের উচ্চারণ হয় না, তাই উহা অজপা-স্বরূপ। শূন্য হইতে বস্তুতঃ উহা উদ্ভূত হয় বলিয়া উহাকে অনহদ বা অনাহত শব্দ বলা হইয়া থাকে। যোগীর প্রধান লক্ষ্যই ঐ শব্দ শ্রবণ করা। উহা সৎপুরুষের সাক্ষাৎকার বা তাদাত্ম্যের প্রতীক।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পিপীলিকা-যোগের লক্ষ্য হইতে বিহঙ্গম-যোগের লক্ষ্য অনেক উচ্চ, কারণ সত্যরাজ্য ভ্রমর-গুহার অতীত এবং ভ্রমর-গুহা মহাশূন্যের পরপারে অবস্থিত। সত্যরাজ্য ত দূরের কথা, মহাশূন্য ও ভ্রমর-গুহাও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, কিন্তু সহস্রদল কমল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। বিহঙ্গম-যোগ প্রধানতঃ এই শব্দ-ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। শব্দ আকাশের ধর্ম্ম। শুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের

ধর্ম্ম চিন্ময় শব্দকে আশ্রয় করিয়া সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তখন সোহং বোধ জন্মে। এই যোগের অনুষ্ঠানে চক্রভেদের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যাঁহারা নিরালম্ব অবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না এবং যাঁহাদের একাগ্রতা নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই মার্গ আশ্রয় করা সম্ভবপর হয় না। তবে একবার শব্দ জাগিয়া গেলে অথবা সৎপুরুষের কৃপায় শব্দের সন্ধান লাভ করিতে পারিলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না। পিপীলিকা-মার্গে ক্রম আছে, কারণ সেখানে অবলম্বন আছে। তাই একটিকে ছাড়িয়া আরেকটিকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিহঙ্গম-মার্গে বাস্তবিক কোন ক্রম নাই, কারণ চলিবার পথ শূন্যের মধ্য দিয়া। মধ্যপথে বিশ্রামের কোন অবকাশ নাই। তাই বিহঙ্গম-মার্গ অক্রম।

(২)

আমরা সাধারণতঃ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে চারিধাম যাত্রার কথা বলিয়া থাকি। এই চারিটি ধাম উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে বিদ্যমান আছে বলিয়া চারিধাম-পরিক্রমা বলিতে একই সময় সমগ্র দেশেরই পরিক্রমা বুঝায়। দিগ্বিজয়ের সময়ে যেমন পূর্ব্বাদিক্রমে চারিদিক্ জয় করিতে হয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক মার্গে চলিতে হইলেও চারিদিক্ আয়ত্ত করিতে না পারিলে পূর্ণত্ব লাভ করা যায় না অর্থাৎ ঐশ্বরিক পদে স্থিতিলাভ করা যায় না। বাহ্য দৃষ্টিতে অখণ্ড ভারতবর্ষকে মানব-দেহের প্রতীক মনে করিয়া চারিধাম এই দেশেরই চারিকোণে স্থাপন করা হইয়াছিল। তদনুসারে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও

বদরীনারায়ণ এই চারিটি স্থানকেই ধাম-চতুষ্টয় রূপে গণ্য করা হয়। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন প্রভৃতি পীঠচতুষ্টয় এই নীতি অনুসারেই স্থাপিত হইয়াছিল। মাধ্বাচার্য্যও আচার্য্য শঙ্করেরই অনুকরণে পীঠচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক যোগ-সাধনাতেও যোগিগণ মানব-দেহে চারিটি পীঠের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সকল পীঠের অনুরূপ পীঠ বাহ্যদেশে অর্থাৎ ভারত ভূমিতেও স্থাপিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক যোগিগণ এই দেহের মধ্যে চারিটি কেন্দ্রে কামরূপ, পূর্ণগিরি, জলন্ধর ও উড্ডীয়ান এই চারিটি পীঠ কল্পনা করিয়াছেন। এই চারিটি অন্তঃপীঠ পরিক্রমা করিতে না পারিলে যোগীর দেহ-তীর্থের যাত্রা সম্পন্ন হয় না। এইগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কল্পিত হইয়াছে। মহাজ্ঞান প্রাপ্তির পূর্ব্বে পরিব্রাজক অবস্থায় সমগ্র বিশ্বকেই পরিক্রমা করিতে হয়।

প্রাচীন সন্ত সম্প্রদায়ে যোগ সাধনার অনুগত চারিটি দিক্ আয়ত্ত করিয়া পরমধামে উপনীত হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে কোন সম্প্রদায়ে যে কোন সাধনাই প্রচলিত থাকুক না কেন সবই এই আধ্যাত্মিক পরিব্রজ্যার অনুগত জানিতে হইবে। মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসুপ্ত ভুজগ আকারে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কুণ্ডলিনীকে সম্যক্‌রূপে জাগাইতে না পারিলে আধ্যাত্মিক সাধনার ঠিক ঠিক সূত্রপাতই হয় না। কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ হওয়ার পর দেহস্থিত চক্র সকলের ভেদ আবশ্যক হয়। হঠযোগে এবং কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে

ষট্চক্র ভেদের প্রসঙ্গ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। চক্রভেদ করার উদ্দেশ্য পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে উপস্থিত হওয়া। জীব দেহাত্মবোধে আচ্ছন্ন হইয়া নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে, এবং ইড়া ও পিঙ্গলা মার্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ না হইলে জীবের এই আত্মবিস্মৃতি ঘুচিতে পারে না। যখন মন ও প্রাণকে একীভূত করিয়া সুষুম্না মার্গে জীব অগ্রসর হইতে থাকে, তখন কালের গতি রুদ্ধ হয় ও জীব নিজবলে এক একটি চক্র প্রাপ্ত হইয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পর পর চক্রগুলি আয়ত্ত করে। এই প্রকারে প্রতি চক্রেই সে একবার বিন্দুতে প্রবেশ করে এবং তাহার পর বিন্দু ভেদ হইয়া গেলে ঐ চক্র ত্যাগ করিয়া আবার অন্য চক্রে প্রবেশ করে। প্রতি চক্রের মধ্য বিন্দুই ঐ চক্রের কেন্দ্র বলিয়া জ্ঞানের এইটি নির্ব্বিকল্প ভূমি। কিন্তু নির্ব্বিকল্প হইলেও উহাতে বিকল্পের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। বিন্দুর পর বিন্দু অতিক্রম করিতে করিতে ভ্রূ-মধ্যের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধতম বিন্দুকে প্রাপ্ত হয়। এই বিন্দুর উপরে মাতৃকা-চক্রের কোন বর্ণই ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। তাই এইটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক ও জ্ঞান-নেত্র নামে পরিচিত। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা নিজের স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। দেহাত্মবোধ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অবশিষ্ট থাকিলে বিন্দুতে প্রবেশ করা যায় না। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধি-স্থান পর্য্যন্ত পূর্ব্ব দিক্‌কার পথ বিস্তৃত। উক্ত সন্ধি ভেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয় ও ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ঘটে। ষট্চক্র ভেদের

সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখের পথের যাত্রা সমাপ্ত হয়। সুতরাং যোগীর তৃতীয় নেত্র উন্মীলন পর্য্যন্তই পূর্ব্ব-মার্গের সাধনা জানিতে হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া মহাশূন্য পর্য্যন্ত গতি পশ্চিম পথ আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বপথের অবসানে যেমন বিন্দুর প্রকাশ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ পশ্চিম পথের অবসানে মহাশূন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পূর্ব্ব পথটি শুক্লপক্ষের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে পশ্চিম পথটিকে কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পূর্ব্বপথে ও পশ্চিমপথে অনুভবের পার্থক্য আছে—পূর্ব্বপথে দৃশ্য সম্মুখে থাকে বলিয়া ঐ পথটিকে প্রারম্ভিক পথ বলিয়া বিবেচনা করা চলে, কিন্তু পশ্চিম পথ ইহার ঠিক বিপরীত। যতই এই পথে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই স্বভাবতঃ যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্তর্মুখে প্রত্যাহার ঘটে। ইহার ফলে মহাশূন্যে উপস্থিত হইলে সমগ্র সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বপথে যে গতি হয় তাহা অন্তর্মুখী গতি। এই গতির উদ্দেশ্য নিজ সত্তার মূল কেন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়া। পূর্ণ একাগ্রতা লাভ সম্পন্ন হইলে মূল কেন্দ্রে স্থিতি হয় বলিয়া পূর্ব্বপথের অবসান হয়। মোট কথা, প্রজ্ঞার উদয় না হওয়া পর্য্যন্তই অন্তর্মুখীন গতি থাকে। তাহার পর ঊর্দ্ধমুখী গতি আরম্ভ হয়। ইহার পর যখন ঊর্দ্ধমুখী গতিও সমাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, পশ্চিম পথেরও কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গতিকে ঊর্দ্ধগতি বলিয়া

নির্দ্দেশ করি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা ঊর্দ্ধগতি নহে। শ্রীঅরবিন্দ যে Inward ও Upward Movement এর কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক এই অন্তর্গতি ও ঊর্দ্ধগতিরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

মহাশূন্যের পথে অনেক কিছু রহস্য রহিয়াছে। উহা মানবীয় ভাষাতে বর্ণনার যোগ্য নহে। এই মহাশূন্যে বহু দুর্ব্বল সাধক অবসন্ন হইয়া আপন আপন তেজ পরিহার পূর্ব্বক সুপ্তবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাকে এক প্রকার লয়ের অবস্থা বলা যাইতে পারে। শ্রেষ্ঠ যোগী অথবা সাধক পূর্ণ সত্যের পথে অগ্রসর হইলে যখন মহাশূন্যের সুপ্ত ও অণুরূপী জীব সকল তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদয় হয়, যাহার ফলে ঐ সকল সুপ্ত আত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। যে সকল আত্মা সৌভাগ্য-সম্পন্ন ও সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপাভাজন তাহারা মহাশূন্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে না,—তাহারা মহাশূন্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই মানস-সরোবরে স্নান করিয়া নিজের মনোময় উপাদান-সত্তাকে বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। মানস-সরোবরে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে মন পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করে এবং চঞ্চলতা পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে একাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। মহাশূন্য মনের অতীত, কিন্তু ঠিক চৈতন্যস্বরূপ নহে। চৈতন্যস্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ার পর জড়ভাব অথবা ভেদভাব লুপ্ত হইয়া যায়। শূন্য অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্মস্বরূপে প্রবেশের দ্বার লাভ হয় না।

বিহঙ্গম-যোগে যে শব্দের কথা বলা হইয়াছে, সুরত শব্দ যোগেও তাহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চিম-মার্গের* সমাপ্তির পর ভ্রমর-গুহাতে প্রবেশের পূর্ব্বে একটু বক্রভাবে ধুন্ধকার মণ্ডলে ঘুরিয়া যাইতে হয়। তখন একটু বামদিকে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে পশ্চাতে যাইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে অর্থাৎ উত্তরদিকে আরোহণ করিতে হয়। ভ্রমর-গুহায় প্রবেশের ইহাই স্বাভাবিক ক্রম।

---

* যোগ-বীজে আছে "পশ্চিম-দ্বারমার্গেণ জায়তে ত্বরিতং ফলম্।" এই গ্রন্থে মর্কট-মত ও কাক-মতের উল্লেখ আছে। একই দেহে ক্রমশঃ শনৈঃ শনৈঃ দীর্ঘকালে যোগসিদ্ধি হইলে উহা মর্কট-ক্রম বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যদি একদেহে সিদ্ধিলাভ না হয় ও প্রমাদ বশতঃ দেহনাশ হয় তাহা হইলে পূর্ব্ববাসনার প্রভাবে আবার শরীর গ্রহণ ঘটে, পুণ্যবশতঃ গুরু লাভ হয় ও পশ্চিমদ্বারের পথে প্রাক্তন জন্মের অভ্যাস নিবন্ধন শীঘ্র ফললাভ হয়। ইহার নাম কাক-মত।

প্রার্থনা

শ্রীউমাতারা দাসী

শ্রীগুরু চরণ স্মরি কৃপার আশায়,
মন প্রাণ জুড়াও হে, শ্রীপাদ ছায়ায়।
তিমির নাশিয়ে মোর, তব প্রেম কান্তি
উদয় হউক হৃদে দিয়ে চির শান্তি ;
রাখ সদা মতি মোর শ্রীচরণ মূলে,
দাও শক্তি সহিবারে বিপদ জঞ্জালে।
সিদ্ধ কর বাসনা হে এসে হৃদি মাঝে,
পেতেছি আসন আমি আজি নব সাজে।
সুখে দুঃখে মোহে তাপে তোমায় না ভুলি,
সকল কাজের মাঝে দাও পদধূলি।
নীচু করে দিও মাথা সবার নিকটে,
হিংসা ঘৃণা অভিমান অহঙ্কার টুটে।
তোমার কাছে প্রার্থনা করি বার বার,—
তব চরণ ছাড়া না হই একবার।

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় পত্র

ওঁ তৎসৎ

১৮৩০, কৃষ্ণপক্ষ।

নারায়ণ স্মরণবর,

পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। এতদিন পত্র না লেখার কারণ আমরা কেহই এখানে ছিলাম না। আর অধিক দিন ভাই তোমাকে তাপ ভোগ করিতে হইবে না। তোমার পরীক্ষার শেষ হইতেছে। প্রাণাধিক, সমদৃষ্টিরূপে হৃদয়কোষে চিত্তকে স্থির করিয়াছ বলিয়াই অধঃ-উর্দ্ধ উভয় দৃষ্টি সমান হইয়াছে। এরূপে অনেক কার্য্য করাইবার জন্যই এত শাসন। ভ্রম মুক্ত চিত্ত প্রতি ঘটনার মূলে আদেশ-তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন জননীর অমিয়মাখা স্নেহ-বাক্যে তৃপ্ত হইতে থাকে, তেমনি অনন্ত জননীর পূর্ণ স্নেহে ধ্যানস্থ চিত্তও ডুবিয়া যায়। স্বর্গীয় অখণ্ড ভাবাবেশে ধ্যানের জীবন্ত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে থাকে—উর্দ্ধ দৃষ্টির তীব্র ধ্যানে উত্তাপশক্তি হৃদয় প্রেমাকর্ষণে শীতল হয়। তখন সেই অনাদি

আনন্দময় গুরুদেবের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, চক্ষের পলক কাল ইষ্ট চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটিলে অশ্রুজলে সকল শরীর ভাসিয়া যায়। আবার ঐ অশ্রুই অখণ্ড ধ্যানের সহায়। নিবিড় অন্ধকারই গন্তব্য পথের সঙ্গী। গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর, ইহাই কর্ম্ম। হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতাই সাধন। গুরুদেবের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ। ইহার অমিয় আস্বাদন কেবল অনাসক্ত সংন্যাস ভাবসম্পন্ন পরমহংসই ভোগ করেন। যাঁহারা ভীষণ কোলাহল পূর্ণ জনতার মধ্যেও গম্ভীর ভাবে চিত্তের অকম্পিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেন না ও নির্ভীক অন্তঃকরণে স্বাভাবিক সরল পথে অন্বেষণে নিভৃত চিন্তা করেন তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস। যাঁহারা মৃণাল-ছিদ্রভেদী সূত্রের ন্যায় অনন্ত যোগ-পথে প্রবেশ করেন, গগন-চিত্রিত নক্ষত্র-মণ্ডল ও জগৎ সকলে গূঢ়-প্রবিষ্ট অস্পর্শ গুরুশক্তি যোগে প্রাণীর প্রাণাধার ভেদ করিয়া আত্মযোগে সমস্ত জগৎ সুধাময় বুঝিতে পারেন তাঁহারাই সংসারে যোগী। বিশুদ্ধানন্দ, সকলই ত বুঝিতেছ ও জানিতেছ। গুরুদেবের কৃপায় তোমার কোন অভাব নাই। তোমার অনেক শিষ্য অনেক সময়ে তোমার উপর সন্দিগ্ধ চিত্তে থাকে। তাহারা জানে না যে গুরুর প্রতি অর্থাৎ তোমার প্রতি, তোমার দয়ার প্রতি, অবিশ্বাস করিয়া কল্পিত অনুষ্ঠানের দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া পথভ্রষ্ট পথিকের মত ক্লেশ ভোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভই হয় না। বলিতে কি তোমার ন্যায় গুরুকে অবিশ্বাস যে করে তাহার অভীষ্ট লাভের ইচ্ছা ক্লীবের পুত্র-মুখ দর্শনের ন্যায়। তুমি কদাচ কাহাকেও কোন বিষয় বলিবে না

বা যোগ-ক্রিয়া দ্বারা দেখিবে না। এমন কি শিষ্যদের বিষয়ও দেখিবে না। যাহা করিতে হইবে সমস্ত আমি করিব ও দেখিব। প্রতিদিনই তোমার শিষ্যের কার্য্য আমি দেখি। শ্রীমান্‌·········কে ক্রিয়া-উড্ডীন যোগ দিতে পার। শ্রীমান্‌·········, ·········, ·········, ·········, ·········, ·········,—ইহাদের ক্রিয়া মন্দ হইতেছে না। সময়ে সময়ে বড়ই বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ এই, ঠিক দেখিতে পাইতেছে না ও মন স্থির হইতেছে না। ইহাদের কার্য্য শীঘ্র হইবে। শ্রীমান্‌ ·········এর উপস্থিত বড়ই বিক্ষিপ্ত অবস্থা। তাহাকে সাবধান করিয়া দেও। চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। তোমার অনেক শিষ্য অল্প দুঃখে অতি কাতর, অল্প সুখে অতি সন্তোষ হয়—তাহারা জানে না যে এ জগতে প্রথমে দুঃখ ব্যতীত সুখের আশা নাই। যাহাদের খুব অশান্তি তাহারা যাহাতে শীঘ্র শান্তি পায় তাহার বিশেষ চেষ্টা হইবে। চিন্তা নাই। শ্রীমান্‌·········কে সাবধান কর, তাহার বোধ খুব কম, বিশেষ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না। তাহার বিষয় তুমি দেখিবে না। যাহা করিতে হইবে বা দেখিতে হইবে আমার দ্বারাই হইবে। সেরূপ নির্ব্বোধ শৈথিল্য লোক আশ্রমের উপযুক্ত নয়। সে ইচ্ছা করিলে পরম যোগী হইতে পারে। আমি তাহাকে দুই তিন বার ক্ষমা করিয়াছি। আশ্রমের অনেক অর্থ ও কার্য্য নষ্ট করিয়াছে। তা'কে খুব সাবধান কর। তুমি যেরূপ ভাবে তাহাকে হৃদয়ের ভাবে করিতে চাও সে ভাবে সে গ্রহণ করিতে চায় না, সে জিনিষ তা'তে নাই। তবে যোগে

অধিকারী হইলে হইতে পারিবে। কেউ জানেনা যে ভৃগুরাম স্বামী আশ্রমের আদি, কেউ জানে না যে ভৃগুরাম স্বামীর আদি অন্ত মধ্য নাই, কেউ জানে না যে ভৃগুরাম পরমহংসের গুরুদেবের বাণলিঙ্গ অলেছ্য। সংসারে সব আশ্চর্য্য। শাস্তি কেউ চায় না। আমার উদ্দেশ্য মহাপাতকদিগকে উদ্ধার করিব, তাতেই পাপীদিগকে স্বর্গ সুখ দিবার জন্য তোমায় শিষ্য করিতে বলা। করি এক, সবে করে এক। শ্রীমান্‌·········এর বিষয় ত্রিপুরা ভৈরবী মাতাকে বেশ করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি কার্য্য করিবেন। তাহার সম্পূর্ণ শুভ হইতে এখনও সময় আছে। তা'র জন্য তুমি ব্যস্ত হও কেন? কদাচ তা'র জন্য কোন বিষয় লিখিবে না।

চতুর্থ পত্র

গাগরি—পাঞ্জাব
১৮৩০। কৃষ্ণপক্ষ।

নারায়ণ স্মরণবরেষু—

পরমহংস জ্ঞানানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। যেখানে আছ সেখানে আনন্দ বা নিরানন্দ কোথায়? সে যে অব্যক্ত পদ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়াদি করিয়া ব্রহ্মের অণুতে থাকা, এই ত পরম পদ। না, আর কিছু আছে? তবে কেন ব্যস্ত হও? সে পদে গেলে সমস্ত এক ব্রহ্মময় হয়, নিজে তাতে এক, কাজেই আর কিছু থাকে না। এই ব্রহ্ম যে কিছু

নয়, অবস্তু ; আবার অবস্তুই বস্তু ভূতে প্রকাশ হইয়াছে। যখন দুই এক তখন সেই একই নিত্য, নির্ম্মল, শিবস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক, অব্যক্ত। তিনি কূটস্থ ব্রহ্ম-স্বরূপ, তাঁহা হইতেই সৃষ্টি ও অন্তে লয়, তিনি পরম ব্যোমস্বরূপ, ত্রিগুণাতীত—সত্ত্ব, রজঃ, তমাতীত সৎ। অগ্রে গুরু বিচার, তারপর আত্মচিন্তন, মনন, ধ্যান। তুমি যেমন গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়াছ, করিতেছ, সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তবে তোমার শিষ্যেরা জ্ঞানের অধিকারী কেন না হইবে? কেন জন্মিবে? সবই ত জান, জানিয়াও অনেক বিষয় ব্যস্ত হও কেন? তাকি বুঝ না? মঙ্গলদাতা বিধাতা নির্ব্বিকার বিকারময় সাকার ভাবেও, পাত্রে পারদবৎ আপনাকে আপনি স্পর্শ করেন না। প্রাণী সম্বন্ধেও তাদৃশ বিধান স্পষ্ট রহিয়াছে। ভ্রান্তি-কুজ্মটিকা-আবরণ ঘুচাইতে পারিলে জীবত্বের উজ্জ্বল তত্ত্ব প্রকাশ পায়। তথাপি সংসারের বিবিধ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গের ন্যায় পাপানলে দগ্ধ হয়। পূর্ণ পরমেশ্বরের কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব কখনই নয়। ইহা কি সম্ভবে? প্রকৃত কার্য্য করিলে কখনই অকাল-মৃত্যু হয় না। তোমার শিষ্যের মধ্যে দুই তিনটি প্রকৃত কার্য্য করা দূরে থাকুক, কিছুই করে না। কাজেই তাহাদিগকে অকালে কাল-সদনে যাইতে হইবে বই কি? তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও। * * * র আয়ু শেষ হইয়াছে। ৬ই বৈশাখ বেলা সাড়ে দশটার পরে তাহার কাল পূর্ণ হইল। এ জগতে তাহাকে আর পাইবে না। তবে তাহাকে জঠর-যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না। তোমার সমস্ত শিষ্যদের জন্য ত্রিপুরা-ভৈরবী মাতা একটি যাগ

করিতে প্রস্তুত আছেন। উক্ত যাগের কারণ আশ্রমের জমা টাকা হইতে একশত এক টাকা পাঠাও। তিনি যাগ করিলে শিষ্যদিগের অশুভ বলিয়া কিছু থাকিবে না। অতএব যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিতেছি। পরমারাধ্য গুরুদেব মনোহর তীর্থে গিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্য সমাধা না হওয়ার কারণ কেহ যাইতেছেন না। পরম পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী দুই তিন দিবস যাইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আশ্রমের দেবালয়ে পৃষ্ঠদেশে অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা মহানিশায় দেখিতে পাইবে। সকল শিষ্যের বিষয় পরে লিখিতেছি।

পঞ্চম পত্র

ওঁ তৎসৎ

পাঞ্জাব, জ্ঞানগঞ্জ হইতে

পাঞ্জাব আশ্রম—

স্বামীজী!

নারায়ণ স্মরণবর বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী বা পরমহংস ভায়া নারায়ণ স্মরণবরেষু—

নারায়ণ স্মরণবর পরমহংস ভৃগুরাম স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরম সন্তোষ হইলাম। শ্যামা ভৈরবী মাতাকে যাহা টাকা পাঠাইয়াছ তাহা তিনি পাইয়াছেন। তুমি যে সকলকে বর্ত্তমান সময়ে শিষ্য করিয়াছ আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিনই যাই ও সম্যক্ দৃষ্টিরূপে প্রতি

ঘরে ঘরে বেড়াই। আমি সমস্তই দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না। তোমার শিষ্যের যে সকল কার্য্য দেখি তাহাতে অধঃ উর্দ্ধ দুইই আছে। যে সকল শিষ্য একবার দীক্ষা লইয়া পুনরায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়াছে তাহারা যেন তোমার পদস্পর্শ না করে, করিলে তাহাদের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাদের পদস্পর্শের অধিকার হইলে তবে স্পর্শ করিতে পারিবে নচেৎ দুই তিন বৎসর স্পর্শ যেন না করে। শূদ্রেরা স্পর্শ করিলে ক্ষতি হইবে না, কারণ তাহাদের সে বস্তু নাই। শ্রীমান্ * * * র বিষয়ে আমাদের আপত্তি নাই, সে যাহাতে সন্তোষ থাকে সেরূপ কার্য্য করিতে পারে। তুমি তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না, প্রতিবন্ধক হইলে তোমার সমূহ ক্ষতি হইবে জানিবে। যে চারিটি ভৈরবীর * * * ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে ভৈরবী মাতারা স্বস্তি করিয়াছেন। আর চারিটি ভৈরবী সেখানে থাকিবেন ও হঠযোগী আটটি থাকিবেন। আর বারটির জন্য তুমি প্রস্তুত হও। তাঁহাদের ব্যবস্থা যেরূপ ভাবে করিতে হইবে তাহা তুমি জান। আমার আশ্রমটি বাণের নিকট করিলেই ভাল হয় বা পূর্ব্বেই যাহা ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই করিতে পার। অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে লিখিব।

শ্রীমান্ * * * আশ্রমটি করিয়া দিব বলিয়াছে। তাহার সময়ে সময়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থা হয়; কাজেই তাহার দ্বারা সমস্ত কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত হওয়া ভাবের অভাব মাত্র জানিবে।

আমি আমি, কি আমি তুমি, কি জগৎ আমি, তাহা আমি জানি না—তবে যাহা লিখিব বা বলিব তাহা অব্যর্থ। দিবারাত্রি

আলো-অন্ধকার দেব-দ্বিজ না থাকিলেও না থাকিতে পারে। সৃষ্টি লয় হইতে পারে, দেবতাদের কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহা ঠিক এবং তাহাই সত্য।* পরমারাধ্য গুরুদেব তিনি আমায় লইয়া এবং তাঁহাকে আমি লইয়া মনোহর তীর্থে যাইতেছি। শিবরাত্রির সময় একবার না একবার আমার ক্রিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবে। আশ্রমের অধিকারী তুমি নও, তোমার শিষ্যেরা। তাহাদের আদেশ মত তুমি আশ্রমে যাইবে বা কার্য্য করিবে, নচেৎ তোমার সমস্ত ক্রিয়া ধ্বংস হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা কাহারও বিষয় কদাচ করিবে না বা দেখিবে না—আমি বলিতেছি অন্য কেহ বলে নাই। ভাই বিশুদ্ধানন্দ, তবে তুমি আমি কে, ভাই? তাহা জানিনা, জানিবার ইচ্ছাও করি না। জগৎ মিথ্যা, মানসিক মানবীয় ভাব সত্য। তাহাতেই বলি সত্য মিথ্যা এক হইল। বিচার করিয়া কার্য্য কর বা বিচার না কর, গুণে ভাবে এক ভেবে যাহা করিবে তাহাই ঠিক। তুমি আমি উপাধিকারী মাত্র। এক ছাড়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু কি আছে, ভাই? যদি থাকে তাহাই আছে। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা, সত্য সত্য প্রকৃতির খেলা কিনা। এ খেলার খেলা যিনি খেলাইতেছেন তিনি জানেন না, যিনি জানেন তিনিই জানেন। জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি, যে জ্যোতি দেখিতে ইচ্ছা করিলে বা দেখিলে বলা যায় না—জ্ঞানে ভক্তি আসিয়া ভাব হয়, তাহাই ঠিক। সকলেই ক্রিয়া করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে।

---

* তুলনীয়—"Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away"—(Mathew 24. 35).

কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা বাঁচা স্থূলের খেলা। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। ব্রহ্ম কি ভাবিবার বিষয়, অন্য কিছু নয়। তুমি, আমি এবং জগৎ। তবে তুমি আমি কে, ভাই? আশ্রমের অর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসীদের জন্য, তোমার আমার নয়। যাহারা অধিকারী, তাহারা অধিকার করিবে। তবে তুমি আমি কে, ভাই? তুমি ভাই এইবার পরমহংস হইলে, তবে পরীক্ষা দিতে হইবে।

ষষ্ঠ পত্র

(পত্রাংশ)

. ...আমাদের অনুমতি ব্যতীত তোমার শিষ্যদের বা অন্য কাহারও বিষয় যোগক্রিয়া বা জ্যোতিষের দ্বারা দেখিবে না। যে মুহূর্ত্তে দেখিতে ইচ্ছা করিবে সেই মুহূর্ত্তে তোমার এতদিনের ক্রিয়ার সমস্ত ফল ধ্বংস করিব। আমি বলিতেছি, অন্য কেহ বলেন নাই। আমি কি তাহা তুমি বিশেষ জান। আমি তোমার সমস্ত শিষ্যের বিষয় দেখি। শীঘ্রই একজন সন্ন্যাসীকে পাঠাইবার মানস করিয়াছি, তোমার সমস্ত শিষ্যের পরীক্ষার জন্য। ক্রিয়া ভাল করিলে উপাধি পাইবে এবং অলৌকিক একটি ক্রিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে সপ্তাহ মধ্যে ফল দেখিতে পাইবে। আশ্রমের বিষয় তৎপর হও। যাহা করিবে তাহা বলিবে না, যাহা বলিবে তাহা করিবে না। গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলে ক্রিয়া নষ্ট হয়। এই পত্রখানি কামাখ্যায় পাঠাও। নকল পাঠাইবে। ....কে যে ক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাই করুক। পশ্চিম আসিতে ইচ্ছা করিলে

.........কে কিম্বা.........কে ভিন্ন কাহাকেও লইয়া আসিবে না। ৺শিব-চতুর্দ্দশীকে অতিক্রম করিয়া তবে আসিবে। ৺শিব-চতুর্দ্দশীতে আশ্রমে আমার দুই একটি খেলা দেখিতে পাইবে। আমার জন্য আশ্রমের কিয়দ্দূরে বিটপী (?) বৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদ্র করিয়া একটি আশ্রম কর। যাহারা ক্রিয়াতে অধিকারী হইয়াছে, সেইরূপ শিষ্যের নিকট অর্থ লইয়া ও ......র নিকট কথঞ্চিৎ লইয়া আশ্রমটি কর। অতিশয় ব্যয় বাহুল্য না হয়। ... ...কে লইয়া উপস্থিত এ বৎসর পশ্চিম আসিবে না, আসিলে তাহার ক্রিয়াও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার নিকট কিছু অর্থ আমার আশ্রমের জন্য লইতে পার। তাহার জন্য নির্দ্ধারিত বিষয় এখন তাহাকে দিবে না, আমি বলিলে তাহাকে দিবে। আশ্রমে যাইয়া তোমার সকল শিষ্য শঙ্করের নিকট যোনিমুদ্রা করিয়া বসিলে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। ক্রমান্বয়ে দেখিবে। দুঃখ ব্যতীত এ জগতে সুখের আশা কম। ঠিক ঠিক ভাবে ক্রিয়া করিলে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবে। ভাই, তুমি এইবার পরমহংস হইলে, পরীক্ষা নিমিত্ত মাত্র জানিবে।* ইতি—

ক্রমশঃ

*এইস্থানে যে তৃতীয় পত্রখানি প্রকাশিত হইল উহার মূল আমার নিকট এখনও সংরক্ষিত আছে। তদনুসারেই উহা প্রকাশিত হইল। 'ছয়খানি পত্র' নামে জ্ঞানগঞ্জের ছয়খানা পত্র ১৩৩৭ সালে ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীর দুইখানা পৃথক্ পত্র সঙ্কীর্ণভাবে এক সঙ্গে চতুর্থ পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ঐ পত্রখানা এইস্থানে প্রকাশিত তৃতীয় পত্রের কিয়দংশ ও শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীর ১৮৩১

শকাব্দে লিখিত অন্ত একখানি পত্রের কিয়দংশ মিলাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ লিপিকরের অনবধানতা বশতঃ এরূপ হইয়াছিল। আমার নিকট সংরক্ষিত শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীর মূল পত্রানুসারে বিশুদ্ধবাণীর তৃতীয় পত্রখানি এখন মুদ্রিত হইল। উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত চতুর্থ পত্রের অন্তিম অংশ (পৃঃ ১১, পংক্তি ১৯—পৃঃ ১৩, পংক্তি ২) এখানে ষষ্ঠ পত্ররূপে মুদ্রিত হইল। —শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কয়েকটি উপদেশ বাক্য*

১। কর্ম্ম না করিলে কিছু হ'বে না, বাপু; কর্ম্ম করা চাই, বচনে কিছু হয় না। কর্ম্ম অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট যোগাভ্যাস। কর্ম্মভ্যো নমঃ।

* পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ৺রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (আলীপুর জজ্ কোর্টের এডভোকেট) শ্রীশ্রীগুরুদেবের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি সন ১৩৩৫ সালে শ্রীগুরুচরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ'র লীলা-কথাতে (উত্তরার্দ্ধ, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১১৯—১৩১) তিনি শ্রীগুরুদেবের পুণ্য-স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গত ২০শে আষাঢ় ১৩৬২ তারিখে রজনী দাদা গুরুধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার বাক্স হইতে কতগুলি চিঠি-পত্রের সহিত একখানি বাঁধানো খাতা পাওয়া গিয়াছে।

রজনী দাদাকে গুরুদেব মাঝে মাঝে যে সমস্ত উপদেশ দিতেন, তিনি সেগুলি একটি খাতাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে কয়েকটি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত এবং বাকীগুলি কথাবার্ত্তার অবসরে উত্থাপিত বিষয়-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রদত্ত। সব উপদেশই সামান্য ভাবে সাধক মাত্রের উপযোগী ও অনুসরণীয়। মনে হয় তিনি উপদেশগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। তবে শুনা ও লেখার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান বশতঃ কোন কোন স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে উপদেশের মর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রজনী দাদার দৌহিত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার ঘোষালের সৌজন্যে ও পরিশ্রমে এই মূল্যবান্ উপদেশগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার

২। প্রশ্ন—কিভাবে থাকিলে ঐ কর্ম্মের সহায়তা হয় ?

উত্তর—রেতঃপাত যত কম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা এবং কপটতা ত্যাগ। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সরল সত্য অবলম্বন করিবে। এ ছাড়া—আহার বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা এবং রাত্রে সামান্য আহার করাই ভাল। পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করা উচিত। **সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবে।**

৩। বাপু, দৃঢ়তার সহিত প্রত্যহ নিয়ম মত যথাসময়ে ক্রিয়া করিয়া যাইবে, সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে, বৃথা কর্ম্মে বা বাক্যে সময় কাটাইও না। দেখিবে কোন বিষয়ে অভাব থাকিবে না, তিনি কোন অভাব রাখিবেন না। যদি অর্থ চাও, তাহারও অভাব হইবে না। **এমন কি না চাহিলেও পাইবে।** জান ত কথা আছে "ভোলা ময়রা বলে, 'আমি সিন্নি না খাব,' আর সত্যনারাণ বলে, 'আমি পোঁদে গেদে দিব'।"

৪। অতি সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। চরিত্র গঠন না হইলে কিছু হইবে না। **সর্ব্বদা চরিত্র বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, সকল স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে দেখিবে।** স্ত্রীলোক দেখিলেই মনে করিবে "ইনি আমার মা।" দুর্জ্জয় রিপু, তাহার সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হয়। তারা কি সহজে ছাড়ে গা, কত রকমে নেড়ে চেরে দেখে, যখন দেখে কিছুতেই তুমি টলিতেছ না তখন আর বিরক্ত করিবে না, বুঝে, এর কাছে সুবিধা হবে না।

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট সেইজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। —শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

কিন্তু একটু পদস্খলন হলেই আবার পেয়ে বসবে। জানত, "নড়ন পোঁয়া ত ডুবলো ডোঁয়া।"

৫। **তোমার মধ্যেই সব আছে,** সংস্কার দ্বারা আবরণ দিয়াছে, ময়লা পড়িয়াছে। সেই আবরণ মুক্ত করিতে হইবে, ময়লা পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহা হইলেই আবার তোমাকে তুমি বুঝিবে। আয়নায় যেমন ময়লা ধরিলে তাহাতে মুখ দেখা যায় না, ময়লা তুলিয়া ফেলিলে, ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিলে, আবার স্বচ্ছ হয়, মুখ দেখা যায় ; ইহাও সেইরূপ।

৬। প্রঃ—ঘষা মাজা কি করিয়া করিতে হইবে ?

উঃ—ক্রিয়া—**যোগ অভ্যাস**। যত খাটিবে ততই পরিষ্কার হইবে। ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে হইবে। **জপের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইবে**। ভোর রাত্রে উঠিবে। সাড়ে তিনটায়, চারটায় উঠিয়া ক্রিয়ায় বসিবে এবং দুই তিন ঘণ্টা ক্রিয়া করিবার চেষ্টা করিবে, এবং ঠিক সন্ধ্যায় বসিয়া দেড় দুই ঘণ্টা ক্রিয়া করিবে। তা ছাড়া **সর্ব্বদাই মনে মনে জপ করিবে**। বৃথা সময় নষ্ট না হয়। বাহিরে কাজ কর না কেন, মনে মনে জপ চলুক। **শ্বাসে শ্বাসে জপ চলিবে, যাহাকে অজপা-জপ বলে।**

৭। বাপু, কর্ম্ম ছাড়া কিছু হইবে না, কেবল কর্ম্ম করিতে হইবে ; "কর্ম্মভ্যো নমঃ।" **অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল নিশ্চয়ই পাইবে। কেহ আটকাইতে পারিবে না।** তেমনি আবার কর্ম্ম না করিলে কিছুই হইবে না। বচনে কিছু হইবে না। **কেবল শাস্ত্র পড়িলেও কিছু হইবে না**। রসগোল্লার গল্প শুনিলে রসগোল্লার আস্বাদন পাওয়া যায় না। খাইতে হইবে। তবে

রসগোল্লা যে কি তাহা বুঝিবে। **উপলব্ধি হইবে। গল্প শুনিয়া কিছু হইবে না।**

৮। প্রঃ—তাহাতে কি কিছুই হয় না?

উঃ—কিছু হয় বই কি। তবে সেটা বিশেষ কাজের হয় না। সমুদ্র তীরে বেড়াইলে উপকার আছে; সমুদ্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হয়, কিন্তু সমুদ্রে অবগাহন হয় না।

৯। প্রঃ—কর্ম্ম বলিতে কি বুঝিব?

উঃ—**গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম**—যোগাভ্যাস। যোগাভ্যাস ছাড়া প্রত্যক্ষ হইবে না—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। **ক্রিয়া-উপযুক্ত আসন করিয়া জপ। ইহাই কর্ম্ম।** এ ছাড়া আর সব যাহা কর তা সবই **অপকর্ম্ম** জানিবে। কর্ম্ম বলিতে ঐ একমাত্র কর্ম্ম। **ঐ কর্ম্ম হইতে সব হইবে। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান আসিবে। জ্ঞান হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেম।** কর্ম্ম করা চাই; কর্ম্মই প্রধান। অতএব কর্ম্মভ্যো নমঃ।

১০। **যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করিবে।** না দিলে পাইবে না। যেমন দিয়া যাইবে তেমন পাইবে।

১১। প্রঃ—ভিক্ষাই অনেকের ব্যবসায়, তাহাদিগকেও কি দান করা কর্ত্তব্য? তাছাড়া, অনেক শঠ, প্রবঞ্চক, চোর আবার নানা প্রকার মিথ্যা ও শঠতা-পূর্ণ বাক্যে অর্থপ্রার্থী হয়, তাহাদিগকেও কি দান করা কর্ত্তব্য?

উঃ—যদি কেহ প্রার্থী হয়, তাহাকে **ঐরূপ অবস্থাতেও কিছু দেওয়াই ভাল।** যে দান করিবে তাহার অত দেখিবার দরকার নাই। **দান একটা সৎ-বৃত্তি; সৎ-বৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়।**

অত বিচার করিলে চলে না। প্রার্থী যদি শঠ হয়, মিথ্যা কথা বলে, সে পাপ তাহার—তাহাতে তোমার প্রত্যবায় নাই।

১২। প্রঃ—সে যদি সেই অর্থ লইয়া মদ্যপান আদি পাপাচার করে, এবং আমিও যদি বুঝি সে অর্থ লইয়া ঐরূপ পাপ কর্ম্মই করে, তথাপি ঐরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে কি দান করা যায়? তাহাতে কি আমার কোন প্রত্যবায় হইবে না?

উঃ—তোমার নিকট ত সে মদ্যপানের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতেছে না। তুমি সরলভাবে যথাসাধ্য দিবে, যে পাপ কর্ম্ম করে সে তাহার ফলভোগ করিবে; তুমি তাহার পাপপুণ্যের জন্য দায়ী নও। যদি পার, তাহাকে উপদেশ দ্বারা অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পার।

১৩। **কামক্রোধাদি রিপু মনুষ্যের অপকারী হয় তাহাদের অপব্যবহার করিলে।** উহাদের ব্যভিচার হইলে মনুষ্যের কষ্টের কারণ হয়, ধ্বংসের কারণ হয়। প্রয়োজন মত সৎভাবে উহাদের প্রয়োগ হইলে উহাদের দ্বারা আমাদের বিশেষ হিতসাধন হয়। **ঐ সমস্ত যদি তাঁহার উপর প্রয়োগ হয়, উহারা কত আনন্দ দেয়।** কামাতুরের ন্যায় ভগবানের দিকে ছোট, তাঁহাকে আলিঙ্গন কর, তাঁহার উপর রাগ কর, তাঁহার জন্য মুগ্ধ হও, তাঁহাতে মেতে থাক, তিনি তোমার আপনার জন, তুমি তাঁহার প্রিয়, তিনি তোমার উপর কৃপাবান্, এই গরবে অহংকৃত হও, ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে। তাছাড়া, দয়া আদি সৎ-বৃত্তি যেমন আবশ্যক, ঐ সব জিনিষও তেমনই আবশ্যক। উভয়ের সংযোগ না হইলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না।

বাপু, ধান হইতে যদি তুঁস ছাড়াইয়া লও, কেবল চাল হইতে অঙ্কুর হয় না ; আবার কেবল তুঁস হইতেও অঙ্কুর হয় না। উভয়ই আবশ্যক। উভয়ের সংযোগ থাকিলে তবেই তাহাতে অঙ্কুর হয়।

১৪। আকাঙ্ক্ষা বাড়াইও না। সেটা কষ্টের, দুঃখের কারণ। পুকুরের পরিসর যত বাড়াইবে, জল ততই বাড়িতে থাকিবে। **নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে।** পরের পিছু মুখ চুলকান ভাল নয়। যে যাহাই করুক না, তুমি তোমার অবস্থা বুঝিয়া চলিবে, তাহাতে কোন লজ্জা বা কষ্ট নাই। অভাব ত আমরা সৃষ্টি করি। অভাব বাড়াইয়া সেই অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিবার কি দরকার, বাপু! পরিবারে বিয়ে দিয়ে কুটুম্ব বাড়ান আর কি!

১৫। ঋণ অতি খারাপ জিনিষ। ঋণ মহাপাপ। **ঋণ করিও না, ঋণ রাখিও না।** একবেলা খাইয়া থাকা ভাল, একদিন অন্তর খাওয়া ভাল, তথাপি ঋণ করিয়া খাওয়া ভাল নয়। ঋণে সব নষ্ট হয়।

১৬। দরজার মোড়ে বসিও না। ভূমিতে বা কোন স্থানে বিনা কারণে আঁক কাটিও না। বিনা কারণে কোন প্রকার শব্দ করিও না। এগুলি বড় খারাপ। উহাতে অনেক অনিষ্ট হয়। দরজার সম্মুখে বসিলে ঋণ হয়। ঐরূপ কাজ করিও না।

১৭। কাহারও সহিত গা ঘেঁসিয়া বসিও না, বিশেষতঃ ভিন্ন শ্রেণী, ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের সহিত। উহাতে উভয়ের পরমাণু-সংস্রবে উভয়েরই অনিষ্ট হয়। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য, শুদ্ধতা

বজায় রাখা বিশেষ দরকার। তাহা না করিলে সাধন সম্বন্ধে উন্নতির বিঘ্ন হয়।

১৮। **ক্রিয়া সম্বন্ধে, কোন দেবদেবী সম্বন্ধে, কোন প্রকার ভাল স্বপ্ন দেখিলে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা ভাল নয়।** তৎসম্বন্ধে কাহারও নিকট আলোচনা করিও না। কারণ তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, যে জিনিষ তোমাতে আসিতেছে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। একটা সৎভাব আসিবার পূর্ব্বে, তোমার মধ্যে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে, তাহার পূর্ব্বাভাস ঐরূপ পাওয়া যায়। সে সময় তাহা বিশেষ গোপনে রাখিয়া, নিজের মধ্যে রাখিয়া, সে বিষয়ে আরও যত্নবান্ হইতে হয়। তাহা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিলে, বাহিরে প্রকাশ করিলে, তাহা আর দেখা দেয় না, আবার সে জিনিষ আসিতে অনেক দেরী হয়। এ জীবনে আর নাও আসিতে পারে।

১৯। সংসারে যাহাকে আমরা পরম আত্মীয় মনে করি এবং সেই জ্ঞানে বা মোহে যাহাদের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আত্মীয় নহে; পরস্পর স্বার্থে জড়িত। সেই স্বার্থের একটু ব্যাঘাত হইলে তাহাদের ব্যবহার দেখিবে কি হয়। কেন, তোমরা ত ওকালতি করগো, দেখ না, বিষয়ের জন্য, স্বার্থের জন্য, এমন কি একটু কড়া কথার জন্য পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, স্ত্রী-স্বামীতে কত বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা হইতেছে। যতক্ষণ তাহাদের স্বার্থ সাধন করিতে পারিবে, তাহারা যাহা চায় তাহাই যোগাইতে পারিবে, ততক্ষণই তাহারা তোমার মিত্র, একটু ত্রুটি হইলেই অমনি গোলমাল। কিন্তু

এক আত্মীয় আছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর, তাঁহার সহিত ভালবাসা কর, দেখিবে কত ভালবাসা তিনি দিবেন। কৃপার অন্ত নাই, দয়ার অন্ত নাই, দানের অন্ত নাই। যদি প্রেম ভালবাসা করিতে হয়, তাঁহার সহিত কর। সে প্রেমে, সে ভালবাসায়, বিচ্ছেদ নাই, পরিতাপ নাই,—কেবল সুখ, কেবল শান্তি, কেবল আনন্দ। বাপু, "জগতের পিরীত যত কাচের মত, ভাঙ্গলে পরে জোড়া না ধরে। অখণ্ড আছে পিরীত শ্যামের, শ্যামের পিরীত ক'জন করে।"

২০। প্রয়োজন হইলে সত্য কথা বলিবে, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হয়, হইবে; পিরীত চটে চটিবে—সত্য কথা বলিতে ভীত হইবে না। সত্য বলিবে, স্পষ্ট বলিবে। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে কাহারও মনে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। প্রয়োজন বিনা অপ্রিয় বলিবে না। কিন্তু আবশ্যক হইলে, প্রয়োজন হইলে, সত্যই বলিবে। তাহাতে যাহা হয়, হউক। "সত্য বাক্যে ভয়ং ক্বচিৎ।"

২১। কোন বিষয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হইও না। একটা কিছু দেখিলে, কি শুনিলে, অমনি তাহাতে মেতে উঠিলে, এটা একেবারেই ভাল নয়। সকল বিষয়ে বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে, বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবে, তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিবে। নচেৎ পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হয়।

২২। প্রঃ—বিশ্বাস ক'রে যদি একটা কার্য্য করি তাহাতে কি ফল হয় না?

উত্তর—বিশ্বাস কাহাকে বলছ? **অন্ধ বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, সেরূপ বিশ্বাসে কোন কাজ হয় না।** আগুনকে শালা বল আর বাবা বল, সে পোড়াবেই। প্রকৃত জ্ঞান হইতে, বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে, যে বিশ্বাস জন্মায়, প্রতীতি হয়, সেই আসল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের উপর কার্য্য করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

২৩। অজ্ঞানে যে পাপ করা যায় তাহা জ্ঞানলাভে খণ্ডন হয়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডন হয়। কিন্তু **তীর্থের পাপ খণ্ডন হয় না।** কঠোর তপস্যা দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু সে ত অতি দুঃসাধ্য।

২৪। ভগবানের সৃষ্ট সকল জিনিষেরই প্রয়োজন আছে, উপকারিতা আছে। কোন জিনিষই খারাপ নয়। ব্যবহার হিসাবে সুফল বা কুফল প্রদান করে। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিলে সকল জিনিষ হইতেই উপকার পাওয়া যায়। সাপের বিষও ত কাজে লাগে, গো! —ক্রমশঃ

"অদ্যাপি হ সেই লীলা"

সম্পাদক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

শ্রীফণিভূষণ চৌধুরী

পর্ব্বত-লঙ্ঘন-প্রয়াসী পঙ্গুর ন্যায় আমিও শ্রদ্ধেয় সতীর্থগণের অনুরোধে মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের দেহোত্তর লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সাহসী হইয়াছি। সূর্য্যের আলোক প্রকাশের জন্য যেরূপ প্রদীপের কোনও প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ তাঁহার মহিমার খ্যাপন আমার বিবৃতির অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আমাব ন্যায় ক্ষুদ্র জীবও যে তাঁহার করুণালাভে কত ভাবে ধন্য হইয়াছে তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সুধীজনের চিত্তাকর্ষক হইবে মনে করিয়াই আমার এ দুঃসাহস। কিন্তু আমার ভাবও নাই, ভাষাও নাই, যাহার দ্বারা সেই করুণাসিন্ধুর কৃপার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া লোকসমাজে তাহা পরিবেশন করিতে পারি।

বাবা দেহে থাকা কালে তাঁহার অলৌকিক মহিমা ও কৃপা তাঁহার প্রায় সকল শিষ্যই কিছু কিছু অনুভব করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে'র তৃতীয় ভাগে (তিন খণ্ডে) অনেকের বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইবার পরও যে তাঁহার কৃপা মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যাইতেছে ইহা

অবশ্যই সকলের মনে আগ্রহের সঞ্চার করিবে। এইরূপ কয়েকটি ঘটনার বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

[ক]

গত পূর্ণকুম্ভ স্নানের জন্য আমি আমার গুরুভ্রাতা শ্রীশচীকান্ত রায়ের সমভিব্যাহারে এলাহাবাদে গমন করি। যেখানে উঠিবার কথা ছিল, সেখানে কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম। পরে রাস্তায় নামিয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময় হঠাৎ শচীকান্তদার এক সহকর্ম্মীর সহিত অদ্ভুতভাবে দেখা হইল। তিনিও কুম্ভ স্নানের জন্য পূর্ব্বদিন আসিয়াছিলেন এবং একটা হোটেলে অতিকষ্টে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ষ্টোভের জন্য তৈল কিনিতে যাইতেছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত দর্শনের ফলে আমাদের তুজনেরই আশ্রয় মিলিয়া গেল। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে যথারীতি পর্ব্ব-স্নানাদি সারিয়া লইলাম। প্রয়াগের তীরে ঐদিন যে মর্ম্মান্তিক তুর্ঘটনা ঘটিয়া-গেল—সহস্র স্নানার্থীর প্রাণহানি হইয়াছিল—তাহা জানিতে পারিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইলাম এবং ঐ দিনই আমি এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। তথায় সরস্বতী পূজা পর্য্যন্ত থাকিয়া পরদিন ৯ই ফেব্রুয়ারী কাশী যাত্রা করি। যখন অমৃতসর মেল বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন প্রয়াগ-প্রত্যাগত অগণিত যাত্রীদের সমাগম দেখিয়া প্রমাদ গণিলাম। গাড়ী আসিবা মাত্র আমি দরজার নিকট যাইবার পূর্ব্বেই প্রায় শতাধিক যাত্রী ঐ কামরায় ঢুকিয়া পড়িল এবং সেই ভীড়ে আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়িল। গাড়ী হইতে

নামিবার কোন আশাই দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে মনে শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে কাশীতে নামিয়া আশ্রম দর্শন করা বোধ হয় আমার ভাগ্যে ঘটিল না। এমন সময় জানলার নিকট হইতে কাহার স্বর আমার কাণে আসিল—"উতরনে নহী সকৃতা, হামারা কাঁধ পর চলা আও।" ফিরিয়া চাহিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শ্বেতশ্মশ্রু-মণ্ডিত এক সৌম্যমূর্ত্তি কুলী অযাচিত ভাবে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। তখনই আবার হাঁক আসিল—"ঘাবরাতে কাহে, জল্‌দি হামারা কাঁধ পর উঠো।" তখন আর কিছু চিন্তার অবসর না পাইয়া জানালা হইতে তাহার কাঁধের উপর উঠিলাম এবং তাহার সাহায্যে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। পরে তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া বিদায় দিবার পর মনে হইল যে বহুদিন হইতে ত কাশী আসিতেছি, কতবার আসিলাম, কই কখন ত এ রকম শ্বেত-শ্মশ্রু-মণ্ডিত ঋষিকল্প কুলী দেখিতে পাই নাই। পরে অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু সেরূপ আকৃতি আর চোখে পড়ে নাই। বেশ মনে হইল যে বিপন্ন পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়াময় পিতা কুলীর বেশে আসিয়াছিলেন।

[খ]

এবারে শিবরাত্রির একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। বাবার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বণ্ডুল গ্রামে। তিনি সেখানে 'হরিহর' শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে বণ্ডুল আশ্রমে একবার শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতে হইবে।

কয়েকটি সঙ্গী জুটিয়া গেল এবং তাঁহাদের আগ্রহেই যাইবার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। তন্মধ্যে একজন ভবানীপুরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনীরদরঞ্জন ঘোষ। তিনি বাবার শিষ্য নহেন, কিন্তু তাঁহার একজন বিশিষ্ট ভক্ত। আর একজন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযতীশচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু (ডাক নাম তারু)। আমরা তিনজনে ৭ই ফাল্গুন বেনারস এক্সপ্রেস যোগে বৈকালে বর্দ্ধমানে পৌছিলাম এবং বাসে করিয়া এগার মাইল দূরে কুচুট গ্রামে গমন করিলাম। ঐখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শিবনাথ চৌধুরী দাদা পূর্ব্ব হইতে একটি গো-যানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া জলযোগের পর আমরা গো-যানে চাপিলাম। মনে একটু সংশয় ছিল, নিজের জন্য ঠিক নয়, সঙ্গে একটি বিশিষ্ট অভিজাত বংশোদ্ভূত ডাক্তার বাবুকে এবং এক পুত্রোপম যুবককে লইয়া যাইতেছি। তাহাদের কোন দিনও এভাবে রাত্রিতে মাঠের মধ্যে দিয়া যাওয়ার অভিজ্ঞতা নাই। আমারও নাই, তথাপি নিজের জন্য ততটা ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, একটি হারিকেনের আলোর সাহায্যে গাড়ী আগাইয়া চলিল এবং আমরা মধ্যে মধ্যে গাড়োয়ানের নিকট রাস্তা ঠিক হইতেছে কিনা জানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পথ অতিক্রম করিবার পর আলোটি নিবিয়া গেল এবং আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আমাদের সঙ্গে টর্চ্চ ছিল, কিন্তু গাড়োয়ান বলিল যে টর্চ্চের আলোয় গরু অভ্যস্ত নহে এবং ইহার সাহায্যে তাহারা চলিতে পারিবে না। কিছুদূর

যাইবার পর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে পথ ঠাওর করিতে পারিতেছে না। আমরা তখন প্রমাদ গণিলাম এবং ভাবিলাম যে এইভাবে বোধ হয় সারারাত্রি মাঠে মাঠে কাটাইতে হইবে। কি জানি কোন ডাকাতের হাতে পড়িতে হয় কিনা কে বলিতে পারে। তখন হতবুদ্ধি হইয়া বোধ হয় ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া থাকিব। সেই অন্ধকারে অজানা পথে গাড়ী আগাইয়া চলিল। তখন সব নিশুতি, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের মাঠ, ধারে কাছে লোকালয় নাই, রাত্রিও প্রায় সাড়ে নয়টা। কোন সাহায্যের সম্ভাবনা দুরাশা মাত্র। আমাদের অবস্থা হালবিহীন নৌকার যাত্রীর ন্যায়। এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ একটা ঝোঁপের মধ্যে আলো দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে আশার রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলাম, দয়াময়ের কৃপা না হইলে এ সময় আলো হাতে করিয়া কে আসিবে। যাহা হউক, গাড়ী সেই আলোর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আমরা ঐ আলোকধারীর নিকট বণ্ডুলের পথের সন্ধান করিলাম। তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন যে আমরা পথ ভুল করিয়াছি এবং গাড়োয়ানকে ঠিক পথের নির্দ্দেশ দিয়া দিলেন। কিন্তু সে তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া যে দিকে গাড়ী চালাইল তাহাতে অন্ধকারে আমাদের গাড়ী আর একটু হইলেই দীঘির মধ্যে পড়িয়া আমাদের প্রাণান্ত ঘটাইত। তখনই মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই আলোকধারী ব্যক্তি গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ীর চালককে ভৎসনা করিলেন এবং গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি তখন ঠিক আমার সামনে

ছিলেন, কিন্তু দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ায় তখন মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে ভালভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা ঘটিয়া উঠিল না। পরে তিনি পথের নির্দ্দেশ দিয়া সরিয়া গেলে পর ডাক্তার নীরদবাবু বলিলেন, "তাইতো, এই অন্ধকারে এত রাত্রে মাঠের মধ্যে কেমন করিয়া একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ?" তখন আমাদের কতকটা চেতনা ফিরিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাঁহাকে বা তাঁহার হস্তধৃত আলো আর দেখিতে পাইলাম না। তখন মনের মধ্যে অনেক জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বণ্ডুল আশ্রমে উপনীত হইলাম এবং স্বস্তি বোধ করিলাম। পরদিন তথায় শিবরাত্রি ব্রত পালন করা হইল। আমার জীবনে এই প্রথম বার বণ্ডুলে শিবরাত্রি হইল। শুনিয়াছি বাবা দেহে থাকিতে তথায় বিরাট্ আনন্দ-উৎসব হইত। তথাপি বলিতে দ্বিধা নাই যে এবারেও আনন্দ বড় কম পাই নাই। একটা অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইল, যাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা আমার মত অর্ব্বাচীনের ধৃষ্টতা মাত্র।

আকর্ষণ এত বাড়িয়া গেল যে ২৯শে ফাল্গুন জন্মোৎসবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এবারে সঙ্গী দুইটি—একটি মান্দ্রাজী ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স-অফিসার, সম্প্রতি বাবার বিশেষ ভক্ত এবং অপরটি বাবার শিষ্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র চন্দননগর নিবাসী শ্রীবিমলপ্রসাদ বসু। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার ঐ বেনারস এক্স্‌প্রেসেই রওনা হইলাম। এবারে দেখিলাম পথে সবই সুরাহা। কুচুটে আমাদের জন্য যে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল তাহা বণ্ডুলের গাড়ী। আসিয়াছিল অন্য যাত্রী লইবার জন্য,

কিন্তু কাঁহার লীলায় জানি না, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার দিনের বেলায় ফিরিবার কথা ছিল বলিয়া আসিবার সময় আলো সঙ্গে লইতে স্থানীয় লোকেরা নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দৈব-প্রেরণায় বুদ্ধি করিয়া আলো সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। অতএব পথে এবারে কোন অসুবিধা হইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বণ্ডুলে পৌছিলাম এবং পরদিন আনন্দ উৎসবের মধ্যে জন্মোৎসব পালন হইল। ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজে যোগ দিলাম।

[গ]

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শরীরটা অসুস্থ হইয়া পড়িল — অম্লবায়ুর উৎপাতে শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল। চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া বণ্ডুল যাত্রা করিলাম। উদ্দেশ্য ছিল শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও কিছুটা উন্নতি হইবে। এবারে সহধর্ম্মিণী সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বণ্ডুলেশ্বর দর্শন হয় নি। এবারে তাঁহার সে সৌভাগ্য মিলিয়া গেল। ১৭ই বৈশাখ কলিকাতা হইতে Kiul Fast Passenger এ রওয়ানা হইলাম। বর্দ্ধমানে বাবার আশ্রমে বিশেষ আদর যত্ন পাইলাম। আমার একটু সন্দেহ ছিল যে আমার স্ত্রীর বরাবর সহরে থাকা অভ্যাস, পাড়াগাঁয়ে মাঠের মধ্যে তাঁহার মন টিকিবে না এবং সেজন্য আমারও হয়ত উদ্দেশ্য বিফল হইবে। কিন্তু করুণাময়ের এমন লীলা যেন অনভিজ্ঞা নবাগতাকে উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্য ঘটনাচক্রে বালীর একটি গুরুভগিনী (শিবরাম দাদার স্ত্রী) আমাদের যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বেই বণ্ডুলে যাইয়া যেন

আমাদের সাহায্য করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পৌঁছিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই আমি নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম। আমার দুর্ভাবনা ও দায়িত্ব অনেকটা কমিয়া গেল। কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইবার দিন প্রাতে আহ্নিক করিতে বসিয়া হঠাৎ অর্থ-চিন্তায় কিছুটা বিব্রত বোধ হইল। সংসারের খরচ মিটাইয়া কয়েকটা টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, তাহাতে কিছুটা অসংকুলান হইবে বলিয়া মনে হইল। এজন্য মনের মধ্যে চিন্তা আসিয়া পড়িল। এমন সময় একটা স্বর স্পষ্ট কাণে শুনিতে পাইলাম—"বৃথা কেন চিন্তা করিতেছ? যাহা মনন করিতেছ তাহাই করিয়া যাও। তোমার নিকট অক্ষয়ের 'যোগিরাজাধিরাজ' পুস্তক এক খণ্ড আছে, তাহা লইয়া যাইও। ঐ পুস্তক বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা উপস্থিত কাজ চালাইতে পারিবে।" শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হইলাম। মনে পড়িয়া গেল যে আমার গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁহার প্রণীত "যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ" পুস্তকের এক খণ্ড বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট রাখিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রাতঃকৃত্য সারিয়াই পুস্তকটি বাহির করিয়া সঙ্গে লইলাম। বাস্তবিক পক্ষে যাহা কাণে শুনিলাম তাহাই কার্য্যে ফলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে পথেই কুচুট গ্রামে পুস্তকটি বিক্রয় হইয়া গেল এবং তল্লব্ধ অর্থে আমার সাময়িকভাবে কাজ চলিয়া গেল। আঠার দিন বণ্ডুলে ছিলাম। সেখানে পদার্পিণ করিবা মাত্র শারীরিক অসুস্থতা কোথায় সরিয়া গেল। বাবার কৃপায় ও বণ্ডুলেশ্বর শিবের কৃপায় স্থান-মাহাত্ম্যে এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল যে আমিও অবাক্

হইয়া গেলাম। কলিকাতায় চিকিৎসায় যাহা ফলপ্রসূ হয় নাই জনসাধারণের অজানা এক জায়গায় যে তাহা এরূপ আশ্চর্য্য ফল দান করিল ইহা সকলের বুদ্ধির অগম্য হইলেও অত্যন্ত সত্য। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে বণ্ডুল আশ্রমের পরিবেশটি অতি নির্জ্জন ও মনোরম এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত ৺হরিহর শিবের যে অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। যদিও বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরের ন্যায় বণ্ডুলেশ্বর জনসাধারণের মধ্যে এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তথাপি আমার মনে হয় অদূরবর্ত্তী কালেই দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পর যাতায়াতের পথ আরো সুগম হইলে বণ্ডুলেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকট হইবে এবং এই অপূর্ব্ব গুপ্ততীর্থ লোককল্যাণ সাধনা নিমিত্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপ একটা কথা যেন গুরুদেবের মুখেও কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন মনে হয়।

যাহা হউক, কয়েকটা দিন বণ্ডুলে পরম আনন্দে ও শান্তিতে কাটিল এবং বাবার সস্নেহ সজাগ দৃষ্টি যে এখনও আমাদের সকলের উপর রহিয়াছে তাহা যেন মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহার মহিমা বর্ণনা করার সাধ্য আমার মত ক্ষুদ্র জীবের নাই। তাঁহার চরণে নমস্কার জানাই। জয় গুরু।

(৬)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব'ল্‌তে গেলে লিখ্‌তে গেলে হারিয়ে ফেলি খেই,
উপমাতে কেবল তাঁরে খাটোই করে দেই।

লীলাময়ের অনন্ত লীলার এককণা মাত্রও বর্ণনা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কেবল এইটুকু জানি যে শ্রীশ্রীবাবা আমাদিগকে সর্ব্বদাই বুকে ক'রে রেখেছেন। কবে থেকে, তা বলবার আমার সাধ্য নেই। বোধ হয় যে মুহূর্ত্তে ছিটকে স্ফুলিঙ্গবৎ পড়লাম, সেই মুহূর্ত্তে বুকে ক'রে এই লক্ষ লক্ষ জন্ম-মরণের মধ্যে দিয়ে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছেন, কোথায় অবসান তা তিনিই জানেন। আমাদের কোন ভাবনা নেই, নিশ্চিন্তে তাঁর বুকে প'ড়ে কেবল তাঁর লীলা দেখছি। সে লীলা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। আমাদের সঙ্গে সেই অনন্তদেবের অনন্ত লীলা—নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টিতে তার একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

আমি একবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ৺কাশীধাম হইতে ভাগলপুর যাইতেছিলাম। কিউল ষ্টেশনে গাড়ী বদল ক'রে যেতে হবে। কিউলে যখন ট্রেণ পৌছুলো, তখন দেখি তু'দিককার প্লাটফর্ম একেবারে লোকে লোকারণ্য। শুনিলাম জৈসিডিতে কি একটা মেলা আছে, সেখানে সব যাবে। যেমন ট্রেণ থামলো অমনি যে ছোট বগীতে আমি ছিলাম তার তু'দিকের দরজা দিয়ে এত লোক ঢুকলো যে আমি নামতে তো পারলামই না, সেই চাপের মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রাণ যায়! তখন বাবাকে স্মরণ ক'রে বল্লাম, "বাবা, আজ এই বেঘোরেই কি প্রাণ যাবে?" ভাবামাত্র শরীরে একটা প্রবল শক্তি অনুভব করলাম এবং সেই শক্তি দ্বারা যে জানালার কাছে ব'সে ছিলাম, ফিরে সেই জানালায় গিয়ে ব'সে বাহিরে অর্থাৎ

(৭)

শ্রীউমাতারা দাসী

আমি বাবার একটি দীন-হীন শিশু সন্তান। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বা বিদ্যা কিছুই নাই। আমি যে ঘটনাটির বর্ণনা দিতেছি তাহা আমাদের বাড়ীতেই ঘটিয়াছিল। উহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহা গত ১৩৫৬ সালের কথা। তখন বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস। ঐ সময়ে আমার একটি পৌত্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া শয্যাগত অবস্থায় ছিল। পৌত্রটির নাম অরূপকুমার। রোগের অবস্থা এরূপ সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছিল যে উহার বাঁচিবার আশা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। বাড়ীর সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কখন কি হয়! সকলেরই চিত্ত বিমর্শ ও উৎকণ্ঠায় ভরপুর। বাড়ীতে চারিজন ডাক্তার চিকিৎসক ছেলেটির অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বেলা দশটা কি সাড়ে দশটার সময় মনে হইল অরূপকুমারের যেন আর কিছুই নাই—সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এদিকে বৌমার করুণ ক্রন্দন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার শোচনীয় পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই মানুষের ধৈর্য্য হারাইয়া যায়। আমিও অধীর হইয়া পড়িলাম। যখন দেখিলাম মনুষ্যের কোন শক্তি কার্য্য করিতেছে না তখন আকুল প্রাণে দয়াল ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম। এই ডাকার ফলেই হউক অথবা বাবার স্বাভাবিক দয়া-দৃষ্টিতেই হউক গুরুদেব সন্তানের ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ শক্তি প্রকাশ করিলেন। ডাকার অব্যবহিত পরেই ঘরে তাহার অঙ্গ-সৌরভ প্রকাশ পাইল। ঐ দিব্য গন্ধে সমগ্র

ঘরটি ভরপুর হইয়া উঠিল। বুঝিলাম বাবা অভয় দিয়াছেন। তিনি যেন গাত্র-গন্ধ দ্বারা বলিয়া দিলেন, 'আর ভয় করিও না, আমি আসিয়াছি।' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ঘরে এই গন্ধ বিদ্যমান ছিল। অরূপকুমারের পিসিমা ও কাকা তাহার মাথার কাছে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা সকলে চুপ কর, আর ভয়ের কারণ নাই, অরূপ আর আছ্ড়ালেও মরিবে না, দাদু-গুরুদেব আসিয়াছেন।" তখন আমরা সকলে রোগীর ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তখনও রোগীর নিকটে শ্রীগুরুর দিব্য অঙ্গ-গন্ধ বাহির হইতেছে, রোগী সুস্থ হইয়াছে এবং চক্ষু খুলিয়া তাকাইতেছে। সে জল খাইতে চাহিল, তাহাকে জল দেওয়া হইল। তাহার পর ক্রমশঃ সে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর রোগের কোন উপসর্গ তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। গুরুদেবের অচিন্ত্য শক্তি ও করুণার বিবরণ দেওয়া মানুষের অসাধ্য।

সোতাপন্ন *

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

'তোমার কৃপার স্রোতের ধারায়
যেদিন নিয়েছ টানি,'
কুলেতে ঠেকিয়া রহিব না পড়ি'
নিশ্চয় ইহা জানি।

কৌশল তুমি শিখিয়ে দিয়েছ
ভাসিতে স্রোতের সাথে,
দুখ এই—মোর কর্ম্মের ফেরে
পটুতা এল না তাতে।

স্রোতে যদি টানে, সংসার পানে
পিছে ফিরে ফিরে চাই,
এগিয়ে চলার প্রমোদ তাই ত
পরাণে কভু না পাই।

জ্বালিয়ে দিয়েছ জ্ঞানের প্রদীপ
নিজের করুণা বলে,
জোর ক্রিয়াযোগে ঢালি না ত তেল,
মিটি মিটি তাই জ্বলে।

* এই শব্দটি পালি, বৌদ্ধগণের অতি পরিচিত। ইহার অর্থ স্রোতঃ-প্রাপ্ত (যে স্রোতে পড়িয়া গিয়াছে)।

সমুখে আমার সুখের আগার
　　সাজিয়ে রেখেছ তুমি,
কত না সুষমা, কত ফুল ফল,
　　মণি-রত্নময়ী ভূমি !

সেদিকে আমার ধায় না ত চোখ,
　　বোধে তাহা নাহি ভাসে ;
তা'ই ত ঘোচে না ক্লেশের তাড়না,
　　মনে বল নাহি আসে।

নিয়েছ যখন চরণে টানিয়া,
　　তোমাতে করিয়া ভর,
শিখাও আমারে চাহিতে সমুখে,
　　ঘুচাও সকল ডর।

ভ্রম-সংশোধন - "বিশুদ্ধবাণী" তৃতীয় ভাগ পৃঃ ২৬, ফুট নোটের পংক্তি ৬ – "শ্রীমুনীন্দ্রমোহন দে দাদার" স্থলে "শ্রীমুনীন্দ্রমোহন দাদার" হইবে।